মুলতানে ফিরে আসেন এবং গড়ে তোলেন সোহরাউর্দী তরীকা। এই সম্প্রদায়ের দরবেশগণ রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রাখতেন।

১৪৮২ খ্রীঃ গউথ জিলানী ভারতে গড়ে তোলেন শেখ আবদুল কাদির জিলানীর নামানুসারে কাদিরিয়া তরীকা। দারাশিকো ছিলেন এই সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী। সপ্তদশ শতকে বাংলাদেশে এই মত প্রচার করেন শাহ্ জানাল। এ ছাড়া যে সমস্ত তরীকা ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করে সেগুলি হল শরমউদ্দিন আলী কলন্দর প্রতিষ্ঠিত কলন্দরিয়া তরীকা শেখ জালালউদ্দিন টবরীজীর 'কাকা' তরীকা যা বাংলাদেশে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

৩৬.২.৫ সুফি সাধদের অবদান

আল্লাহ্ তথা স্রষ্টার সঙ্গে মিলিত হওয়াই সুফি সাধকদের প্রধান লক্ষ্য হলেও অধিকাংশ সুফি সাধকই সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জন সাধনার মাধ্যমে আত্মমুক্তির কথা ভাবেননি। অন্যতম সুফি সাধক খাজা মইনুদ্দিন চিশতির বক্তব্য এখানে তুলে ধরা যেতে পারে — যে দোজখের অনল থেকে ও রোজ কেয়ামতের ভীতি থেকে মুক্ত থাকতে চায় তাকে আল্লাহর বন্দেগী করতে হবে। তাঁকে (আল্লাহকে) সে (সাধক) সুক্ষাতিসুক্ষ ভাবে বন্দেগী করবে যা সকল বন্দনার শ্রেষ্ঠ - যেমন বিক্ষুব্ধকে বিচারদান, অসহায়কে সাহায্য, ক্ষুধার্তকে অনুদান। আমরা এই বিষয়টি সুফি সাধকদের অবদান প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

৩৬.২.৬ জনকল্যানকর কার্যসম্পাদন

দশম শতকের পর থেকেই মরমীয়া সুফি সাধকগণ ভারতের বিভিন্নপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন; গড়ে তোলেন প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে দরগা এবং খানকাহ (আস্তানা)। এই খানকাহগুলি বস্তুত ছিল একাধারে সাধনক্ষেত্র, অন্যদিকে আশ্রয়স্থল ও চিকিৎসাকেন্দ্র। এখানে ধর্মনির্বিশেষে দুঃস্থ, উন্মাদ ও অসুস্থ ব্যক্তিরা আশ্রয় পেত। এই সমস্ত খানকাহগুলির সঙ্গে লঙ্গরখানা বা বিনাখরচে খাবার ব্যবস্থাও থাকত। এই সমস্ত খানবাহগুলির খরচ মেটানোর জন্য বিষয়সম্পত্তিও দান করা হত কখনও সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের কাছ থেকে কখনও রাষ্ট্রের কাছ থেকে। এভাবে সুফি সাধকগণ বিভিন্ন জনকল্যানমূলক কাজ সম্পাদন করে সাধারণ মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

৩৬.২.৭ সাংস্কৃতিক সমন্বয়

সুফি সাধকদের দরগায় হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই যোগ দিত। ধর্মান্তরিত মুসলমানগণও তাদের পূর্বেকার সংস্কার ও আচারাদি অনুষ্ঠান করতে পারত। সুফিগণ এব্যপারে কঠোর ভাবে শরিয়ত অনুশাসনের প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন না। এইসমস্ত সুফিসন্তগন ভারতের বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রসাধক, নাথযোগীদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে প্রচার করতেন। হলায়ুধ মিশ্র রচিত 'শেখ শুভোদয়া' গ্রন্থ থেকে জানা যায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মানুষ রোগমুক্তি, সন্তানকামনা ও সৌভাগ্য লাভের আশায় এই সুফিসন্তের কাছেই অনুগ্রহ কামনা করে প্রার্থনা জানায় এবং অনেকেই তাঁর নামে বিষয়সম্পত্তিও উৎসর্গ করে। সে সময়কার হিন্দধর্মের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের

জাতভিত্তিক কঠোরতা, অন্ত্যজ জাতগোষ্ঠীগুলির প্রতি উচ্চ জাতভুক্ত ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নির্যাতন, অবক্ষয়িত ও তন্ত্রজর্জরিত বৌদ্ধদের বিকৃত জীবনবোধ, নাথপন্থীদের তন্ত্রসর্বস্বতা, সমাজে সহজিয়াপন্থীদের প্রতি নিষ্করুণ ব্যবহার — এসবই ছিল মধ্যযুগের শেষ দিকের ভারতীয় সমাজজীবনের বাস্তব চিত্র। এই অবস্থায় সুফিদের সহজ ও সরল জীবনাযাত্রা, মানুষের কাছাকাছি থাকা ও দুঃখ দুর্দশায় অংশনেওয়া স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুসমাজকে, বিশেষভাবে অন্ত্যজ গোষ্ঠীগুলিকে, সহজিয়াদের আকৃষ্ট করে। সমাজের এই সাধারণ মানুষের স্তরে গড়ে ওঠে এক সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক লেনদেন-এর পরিবেশ। এই পরিবেশেই সত্যপীর পূজার উদ্ভব। অন্যান্যক্ষেত্রেও এই সমন্বয়ী ভাবধারা লক্ষ করা যায়।

হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় সাধনা একদিকে যেমন সমাজের নিচে তলায় দেখা যায়, অপরদিকে সুফিসাধক ও সুফিপ্রভাবিত তাত্ত্বিকগণ ভারতীয় দর্শন ও শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলির অনুবাদে অগ্রসর হন। সুফিপ্রভাবিত দারা সিকোহ ফারসীতে উপনিষদের অনুবাদ করনে। আঞ্চলিক ভাষার বিকাশও ঘটতে থাকে সাধারণ মানুষের সংঙ্গে সংযোগ গড়ার তাগিদে।

৩৬.২.৮ ইসলামের প্রসার

আধ্যাত্মিক উন্নতি বা জনকল্যানমূলক কাজকর্মছাড়াও ইসলামের বিস্তারে সুফিগণ এক প্রধানভূমিকা নেন। দশমশতকে ইসলামের মধ্যেকার ক্ষমতার লড়াই উমাইয়া গোষ্ঠীর (খ্রীঃ ৬৬১-৭৫০) হাত থেকে আব্বাসীদের খলিফাতন্ত্র (খ্রীঃ ৭৫০-১২৫৮) দখল, আরবকেন্দ্রিক ইসলামের বিকেন্দ্রিকরণ প্রভৃতি ঘটনাগুলি যেমন ঘটতে থাকে, আরব দেশ থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সুফিদরবেশগণ এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে যেক্ষেত্রে ইসলাম রাজশক্তির অধিকারী, ছড়িয়ে পড়তে থাকেন। এভাবেই ভারতের বিভিন্নপ্রান্তে, বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে, সুফিগণ দরগা বা আস্তানা গড়ে তোলেন। বিভিন্ন সুফিসম্প্রদায়ের মধ্যেও শুরু হয় প্রাধান্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা এবং এর জন্য প্রয়োজন নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি জনসমর্থন আদায়। এই সমস্ত সুফিদরবেশগণের অসাধারণ নৈতিকগুণ, দুঃখ কষ্ট সহ্যকরার অসীম ক্ষমতা, অনাড়ম্বর জীবন যাপন, দুঃস্থ মানুষদের জন্য গভীর সহানুভূতি ও সেবামূলক মনোভাব, ইসলামের ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধ ভারতে অ-মুসলমান জনগোষ্ঠীগুলিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের চাপে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে নির্যাতিত অন্ত্যজ জাতগুলি, বৌদ্ধজনগোষ্ঠী, নাথপন্থী ও সহজিয়া গোষ্ঠী, উপজাতি গোষ্ঠীগুলি (বিশেষভাবে সিন্ধুপ্রদেশের) ইসলামের মধ্যে খুঁজে পায় এক মানবিক মর্যাদাবোধ, স্তরহীন সমাজের স্বাদ ও সরাসরিভাবে ঈশ্বর ভজনার অধিকার। ডঃ এস. এ. রহিম এর রচনা থেকে জানা যায়, উত্তরবঙ্গে শেখ জামালউদ্দিন তাবরিজী, পূর্ববঙ্গের সিলেটে শাহজালান, খুলনা-যশোহরে মুজাহিদ দরবেশ খান জাহান আলি ইসলামে দীক্ষিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। ভারতে মুসলমান জনগোষ্ঠীর ভৌগোলিক অবস্থান থেকে অনুমান করা যায় সুলতান ও মুঘলশাসনাধীন ভারতে রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগ এর মাধ্যমে ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মান্তরিতকরণ প্রক্রিয়া চলেছে সুফিসন্তদের দ্বারা এবং বহুবছর ধরে ক্রমান্বয়ে।

৩৬.২.৯ রাজনীতি ও সুফিসাধক

সাধারণভাবে ধারণা করা হয়, সুফি দরবেশগণ রাজনীতি থেকে যথাসম্ভব দূরে থেকে নির্জনে

সাধনার মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্খায় মগ্ন থাকতেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, প্রথমদিকের কিছু কিছু সুফিসন্তদের বাদ দিলে পরবর্ত্তীকালের অধিকাংশ সুফি দরবেশদের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কে ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ডঃ এম. এ. রহিম এর মতে, "ইসলামের প্রসার ছাড়াও বাঙলা দেশে মুসলমানদের রাজ্য বিস্তৃতি ও মুসলিম রাষ্ট্রের সংহতি বিধানে মুসলমান সুফী-দরবেশদের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কখন নিজেরা, কখন মুসলমান সেনাপতিদের সঙ্গে সহযোগিতায় তারা প্রদেশের শেষ সীমা পর্যন্ত মুসলিন অধিকার কায়েম করেন"। উদাহরণ হিসেবে ডঃ রহিম সাতগাঁয়ের হিন্দুরাজার বিরুদ্ধে মুজাহিদ দরবেশ জাফরখান গাজী ও শাহ সফিউদ্দিন এর ভূমিকা এবং সিলেটের হিন্দুরাজার বিরুদ্ধে সুফি শাহজাহান এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করেন। এ সমস্ত ঘটনা থেকে ডঃ রহিম সিদ্ধান্ত করেন, "সাধারণত তাঁরা (সুফিদরবেশগণ) রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতেন না কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজের বিপদের দিনে তাঁরা কখন ও নির্বিকার থাকেন নি"। এমনকি কখনও সুফিসন্তগণ সুলতানকে রাজ্য শাসনব্যাপারে পরামর্শও দিতেন। সোহরাবর্দী সম্প্রদায়ের সঙ্গে রাজশক্তির সম্পর্কে ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এছাড়াও, ডঃ রহিমের মতে "মুসলমান সেনাপতিদের সামরিক ও ভৌগোলিক বিজয়ের সঙ্গে সুফীদরবেশগণ ইসলামে দীক্ষাদান করে ও শিষ্য সংগ্রহ করে নৈতিক বিজয় যুক্ত করেন এবং এভাবে একটি অ-মুসলিমদেশে মুসলিমরাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও শক্তির উৎস প্রদান করেন"।

সুলতানী এবং বিশেষ করে মুঘল শাসকগণ ভালোভাবেই জানতেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন স্বধর্মাবলম্বীদের নিয়ে ভারত শাসন করা অসম্ভব। একারণে তাঁরা হিন্দু-বৌদ্ধ নির্বিশেষে স্থানীয় মানুষদের মধ্য থেকেই সহায়ক শ্রেণী গড়ে তোলেন। অন্যধর্মের মানুষ হলেও এই সহায়ক শ্রেণীর সঙ্গে বহিরাগত শাসকশ্রেণীর সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। দরবারে শরিয়তি আইনবিষারদ হিসেবে কাজী, মৌলভী যেমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেতেন হিন্দু বা অন্য ধর্মভূক্ত ব্যক্তিগণও রাষ্ট্রশাসনের প্রয়োজনে শাসকের কাছে গুরুত্ব পূর্ণ বলে বিবেচিত হতেন। বাংলার সুলতানগণ রাজ্যপরিচালনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ পদে শুধু নিয়োগই করেন নি, এমনকি বাংলার অধিবাসীদের স্বদেশপ্রেমের উপর তাঁদের শক্তির ভিত গড়ে তুলে দিল্লীশাসকের নিয়ন্ত্রনমুক্ত ও হতে চেয়েছিলেন। মেবারেও শাসক আকবর পিতা আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন রাজপুতদের সহায়তায়। এখানে দূর্গাদাস রাঠোরে সঙ্গে আকবরের বন্ধুত্বে ধর্ম বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। রাষ্ট্রশক্তির সহায়কশ্রেণী হিসেবে হিন্দু মুসলমান উভয়েই ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ হিসেবে কবীরের জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। কবীর ছিলেন হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মেরই রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের বিরোধী। কবীরের জনপ্রিয়তা ও সার্বজনীন দৃষ্টিতে অসন্তুষ্ট ও ঈর্ষান্বিত ক্রুদ্ধ মৌলবী ও হিন্দু পন্ডিতরা কবীরের বিরুদ্ধে বাদশাহ সিকন্দর লোদীর কাছে অভিযোগ করে। বাদশাহের হুকুমে দরবারে হাজির হয়ে কবীর দেখলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে মৌলবী ও হিন্দু পন্ডিত অভিযোগকারীরা হাজির হয়েছেন। প্রীত হয়ে তখন কবীর বললেন যে, দুনিয়ার যিনি বাদশাহ তাঁর দরবারেই যদি মৌলবী পন্ডিতের ঐক্য হয়ে থাকে তাহলে সব বাদশাহের যিনি বাদশাহ তাঁর দরবারে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য না হওয়ার কোন কারণ নেই। অনুরূপ ঘটনা ঘটে বাংলাদেশেও। গৌরাঙ্গের নাম সংকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে পন্ডিতগণ সমবেত হন সুলতান হোসেন শাহের কাছে নালিশ জানাতে।

রাষ্ট্রশক্তির সহায়কশ্রেণী হিসেবে মৌলবী-কাজী-ব্রাহ্মণ পন্ডিত যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, প্রয়োজনে সুফি দরবেশগণও রাষ্ট্রশক্তির সহায়ক ভূমিকা পালনে দ্বিধা করেন নি। এবং এব্যাপারে তাঁরা সবসময় মানবকল্যানমূলক প্রেমময় দৃষ্টিভঙ্গি বজায়ও রাখতে পারেন নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলার ইলিয়াসশাহী সুলতানগণ রাষ্ট্র পরিচালনায় বেশী সংখ্যক হিন্দুদের নিয়োগ করায় এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে স্থান দেওয়ায় সুফি দরবেশ শেখ আলাউল হক সুলতানদের কঠোর সমালোচনা করেন। অনুরূপভাবে, সুফি হজরত মাওলানা মুজাফফর শামস বলখী ও সুলতান সিকন্দর শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী গিয়াসউদ্দিন আজম শাহকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে হিন্দুদের নিয়োগ করার ব্যাপারে সতর্ক করেন।

সিন্ধুপ্রদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে সুফি দরবেশদের সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরেন আনসারী (Sarah F.D. Ansari)। তিনি সুফি দরবেশগণকে শাসক ও শাসিতের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। আনসারীর মতে ৭১১- ১২ খ্রীঃ মুহম্মদ বিন কাশিম এর সিন্ধু আক্রমনের পিছনে ছিল অর্থনৈতিক সম্পদ লুণ্ঠনের তীব্র আকাঙ্খা। সিন্ধু অঞ্চল সেসময় একদিকে ছিল সম্পদে পূর্ণ অপরদিকে ছিল গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র। এর আগের দিনগুলিতে আরবের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য পরিচালিত হলেও আরব বণিকগণ মূলত বন্দর এলাকাতেই কাজকারবার করতেন। কিন্তু ভারতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গে ভারতভূখন্ডের অন্যান্য অঞ্চলেও এই বনিকগন প্রবেশ করতে থাকে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এদেরই অনুসরণ করে সুফি দরবেশগণ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আস্তানা/দরগা/খানকাহ গড়ে তোলেন। ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতে ইসলামকে জনপ্রিয় করে তোলেন এই সুফিদরবেশগন এবং এভাবে ইসলামের প্রসার ঘটিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তিকেই সুদৃঢ় করেন। সুফি দরবেশগণ স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানের সঙ্গে বৃহত্তর ইসলামীয় জগতের সংযোগ স্থাপন করেন; তাঁদের দরগাগুলি ইসলামীয় সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে যা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রশক্তিকেই মজবুত করে।

আনসারী মনে করেন, সুলতানগণ ভালো ভাবেই জানতেন যে ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে শাসনক্ষমতা কায়েম করতে গেলে স্থানীয় হিন্দুও বৌদ্ধদের সহায়তা অত্যন্ত প্রয়োজন। একারণে তাঁরা ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মান্তরিতকরণের পরিবর্তে স্থানীয় জনগণের বিশ্বাসের সঙ্গে সমঝোতার ব্যাপারে সচেষ্ট হন। প্রথমে ইসমাইলীয়গণ মুলতানে সূর্যমন্দির ধ্বংস করার পরিকল্পনা নিলেও পরে সূর্যমন্দির ধ্বংস করার পরিবর্তে স্থানীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচরণের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে থাকেন এবং জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির পরিবর্তে সহানুভূতি, সহযোগিতার মাধ্যমে ধর্মান্তরিতকরণে সচেষ্ট হন। গল্পগাথায় মুহম্মদ পরিণত হল ব্রহ্মে, আলি বিষ্ণুতে, আদম শিবে এবং সুফি সাদরুদ্দিন স্বয়ং বলরামে।

রাষ্ট্রকাঠামোয় সুফিদরবেশদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টি তুলে ধরেন সুফি মকদুন। তিনি শাসকের সহায়ক তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দূর্গের কথা বলেন। প্রথমদূর্গ হল জনসাধারণ। এই দুর্গটি মাটি দিয়ে তৈরী, যাকে ন্যায় এর চুন সুরকি দিয়ে মজবুত করতে হবে যাতে শাসনে ভেঙ্গে না যায়। দ্বিতীয় দূর্গটি লোহা দিয়ে তৈরী যা সামরিক বাহিনীর দ্যোতক। পুরষ্কারও সাহায্য দিয়ে গড়া এই দূর্গ দেশকে বিদ্রোহ ও আক্রমণএর হাত থেকে রক্ষা করবে। তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দূর্গটি কঠিন ইস্পাতদিয়ে তৈরী, এরা হল দরবেশ বা জ্ঞানী যারা আল্লাহ'র মানুষ। অতএব রাজার কর্তব্য হল এদেরকে যথাযথভাবে সম্মান এবং কোষাগার

থেকে ন্যায়সম্মত সম্পদ দিয়ে সন্তুষ্ট করা; কারণ বাস্তবে এদের হাতেই শাসনপরিচালনার ভার থাকে। শাসকগণ ও সুফিদের সাহায্য ও সহযোগিতাকে যথাসম্ভব গুরুত্ব দিতেন এবং পুরস্কার হিসেবে জমিদান করতেন।

আনসারীর মতে, ভারতে সুফিগণের অনুপ্রবেশ ও বসবাসের কিছুকাল পরে সুফি দরবেশগণ ক্রমশ প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে উঠতে থাকেন। শিষ্যগণ দরবেশগণের কবরস্থানগুলিকে পবিত্র ও ঐশীক্ষমতার আধার হিসেবে পূজা করতে থাকে। সুফিদরবেশের মৃত্যুর দিনটি আল্লাহর সঙ্গে দরবেশের মিলনের দিন হিসেবে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়। সুফিদরবেশের বংশধরগণ (যা প্রথমের দিকে ছিল একমাত্র যোগ্যশিষ্য) সুফির ন্যায় ঐশী শক্তির অধিকারী না হয়েও ধর্মীয় নেতৃত্বের অধিকারী হন। এভাবেই সুফি দরবেশকে কেন্দ্র করে এক একটি ঘরানা বা সম্প্রদায় গড়ে উঠতে থাকে। রাষ্ট্র এবং শিষ্যদের কাছ থেকে জমি ও অন্যান্য সম্পদ ও অর্জিত হতে থাকে। জমি ও সম্পদের এই মালিকানা ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব একদিকে যেমন সুফি পরিবারগুলিকে ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন করে তোলে, অপরদিকে রাষ্ট্রশক্তির স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে ভূমিকা পালনের আগ্রহ দেখা দেয়। সুফিগণও সুলতানের মতো মাথায় পাগপরা, সিংহাসনের মতো গদিতে বসা মুরিদ বা শিষ্যদের কাছ থেকে নৈবেদ্য গ্রহণ করা, এমনকি শিষ্যদের মধ্যেকার বিরোধ মীমাংসা করা প্রভৃতি ঘটনাগুলির মাধ্যমে ক্রমশ সুফিপদের রাজনীতিকরণ ঘটাতে থাকেন।

সিন্ধু এলাকার সুফিগণ আর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দায়িত্বও পালন করেন। বিভিন্ন উপজাতিদের ইসলামে দীক্ষিতকরণ, উপজাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যস্থতাকরা, ভ্রাম্যমান পশুপালক উপজাতিগুলিকে কৃষিজীবিতে রূপান্তরিত করা, উপজাতিদের সঙ্গে বাইরের জগতের সম্পর্কস্থাপন, ইসলামে দীক্ষিতকরণের মাধ্যমে সীমান্তএলাকাকে সুরক্ষিত করা প্রভৃতি কাজগুলি নিঃসন্দেহে শুধুমাত্র ধর্মীয় কাজ নয় — সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাজ যা সিন্ধু অঞ্চলের সুফি দরবেশগণ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই করে গেছেন। দরগাগুলি ও শুধুমাত্র ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানাদি সম্পাদনের ক্ষেত্র হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি; উপজাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন এরও কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে। জিনিষের কেনাবেচা, পরস্পরের ভাব/মত বিনিময়, ধর্মীয় আলোচনা, বিরোধী নিষ্পত্তিকরা— সব কিছুরই কেন্দ্রস্থল ছিল এই দরগা। এভাবে ধর্মীয় ক্ষেত্রের সঙ্গে স্থানীয় রাজনীতিতেও সুফি দরবেশগণ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকেন।

৩৬.৩ মধ্যযুগে ভক্তি আন্দোলন

মধ্যযুগের ভারতে হিন্দুজনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে এক জোয়ার দেখা যায় — ভক্তি সাধনার জোয়ার, যদিও জোয়ারের ধরন ও জোয়ার-ভাঁটার খেলা বা গভীরতা সব জায়গায় একই রকম ছিল না। মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতে এর শুরু; ব্যাপ্তিকরণ খ্রীষ্টীয় একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতক; যদি ও এর আগেই খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকেই এর সূচনা লক্ষ করা যায়। একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের প্রধান সাধক রামানুজ নিম্বার্ক, মাধব ও বল্লভাচার্য। প্রায় চারশো বছর পর এর ঢেউ এসে লাগে উত্তরভারতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে। উত্তর ভারতে যারা এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ তারা হলেন রামানন্দ, নানক,

কবীর, দাদু তুলসীদাস; আর পূর্বভারতে চৈতন্যদেব (খ্রীঃ ১৪৮৬-১৫৩৩) ছিলেন এই আন্দোলনের পুরোধা। মহারাষ্ট্রে এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হলেন জ্ঞানদেব, তুকারাম, নামদেব, এবং রামদাস।

মধ্যযুগের ভারতে এই ভক্তি আন্দোলনের কারণ হিসেবে সাধারণত ইসলামের, বিশেষ করে সুফিবাদের (যা আমরা আগের অংশে আলোচনা করেছি) প্রভাব এর উল্লেখ করা হয়। এই ধরনের সিদ্ধান্ত কতদূর যুক্তিযুক্ত যে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। ভক্তিসাধনা বলতে কি বোঝায়, বৈশিষ্ট্য, ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভবের কারণ, দক্ষিণভারতে, মহারাষ্ট্রে, উত্তর ভারতে, পূর্বভারতে ভক্তি আন্দোলনের প্রকৃতি আমাদের বর্তমান আলোচনার মূল বিষয়। ভক্তি আন্দোলনের ফলাফলের উপর আলোচনা করা হবে।

অবশ্য মধ্যযুগের এই ভক্তি আন্দোলনকে আদৌ আন্দোলন বলা যায় কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রশ্ন ওঠে এই ভক্তি আন্দোলন প্রকৃত অর্থে গণ আন্দোলন ছিল কি না। কারণ এই আন্দোলনের ব্যাপ্তি ছিল সীমিত। তাছাড়া যে কোনও আন্দোলন সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা বলে। কিন্তু ভক্তি আন্দোলনে এধরনের কোনও সমাজপরিবর্ত্তনের কথা বলা হয় নি। ব্যক্তিগতভাবে আত্মার মুক্তি বা ঈশ্বর/স্রষ্টার সঙ্গে মিলনই এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। সর্বোপরি, ভক্তি আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিদের বক্তব্যের মধ্যেও ছিল যথেষ্ট ভিন্নতা। ঈশ্বরের স্বরূপ, ভক্তের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক, ঈশ্বর সগুণ না নির্গুণ, এই সব প্রশ্নে ভক্তিসাধকগণ একমত পোষণ করেননি। একারণে এই আন্দোলন ছিল বহুমুখী ও বহুমাত্রিক। পরবর্ত্তীকালে এই আন্দোলন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিন্দু সমাজব্যবস্থায় পৃথক জাত বা সম্প্রদায় হিসেবে বিলীন হয়। একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন নানকপন্থীগণ, যাঁরা পরবর্ত্তীকালে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যদিয়ে সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেছেন এবং এক পৃথক ধর্ম-শিখ ধর্মের উত্থান ঘটিয়েছেন।

৩৬.৩.১ ভক্তিসাধনা কাকে বলে

মধ্যযুগে ভারতে ধর্ম সাধনার যে নতুন ধারাটি লক্ষ করা যায় তা তাত্ত্বিকগণ ভক্তিবাদ, ভক্তিপথ, ভক্তিমার্গ, ভক্তিসাধনা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন। ভক্তি শব্দটি এসেছে ভজ্ ধাতুর সঙ্গে ক্তিন/তি প্রত্যয় যোগ করে। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগতভাবে এই শব্দটির অর্থ হল অংশগ্রহণ, অভিজ্ঞতা, আচরণ, কর্ষণ, অনুরাগ ইত্যাদি। পানিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে এর অর্থ করা হয়েছে ভাব বা অবস্থা, অনুরাগ বা আকুতি, যা কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি প্রযুক্ত হতে পারে। এদিক থেকে ধর্মীয় বা পার্থিব যে কোনও বিষয়ের সঙ্গে ভক্তি শব্দটি যুক্ত হতে পারে। যেমন গুরুভক্তি, পিতৃ-মাতৃভক্তি, দেশভক্তি, ঈশ্বরভক্তি ইত্যাদি। ধর্মীয় ব্যাপারে দেবতার ধরন অনুযায়ী শিবভক্তি, বিষ্ণুভক্তি, কালীভক্তি, কৃষ্ণভক্তি ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়। এদিক থেকে শব্দটির মাধ্যমে শুধুমাত্র ধর্মীয় অর্থে প্রয়োগ বা শব্দটি দ্বারা কোনও বিশেষ ধর্ম বা পূজাপদ্ধতি বা মতবাদকে বোঝায় না। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই শব্দটি ব্যবহার করা হয় এক বিশেষ ধর্ম বা পূজাপদ্ধতি হিসেবে, যা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী এবং যেখানে ব্যক্তি মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে ভাব ও ভালবাসা দিয়ে ব্যক্তিগত সম্পর্কস্থাপনে প্রয়াসী। এই প্রচলিত মত অনুসারে ভক্তি এক বিশেষ ধরনের পথ যা জ্ঞানপথের বা কর্মপথের বিরোধী, ভক্তের ব্যক্তিগত আবেগ, আকাঙ্খা, সরলতা, ঐকান্তিকতাই প্রধান। একারণে ভক্তিকে এক বিশেষ মতবাদ হিসেবেই সাধারণত ব্যাখ্যা করা হয়।

কৃষ্ণা শর্মার মতে, মধ্যযুগের ইতিহাস বিশ্লেষণে অধিকাংশ তাত্ত্বিকই ভক্তি শব্দটি এভাবে একটি বিশিষ্ট ধর্ম, মতবাদ বা পূজাপদ্ধতি (cult) অর্থে প্রয়োগ করায় কতকগুলি ভুল সিদ্ধান্তের কবলে পড়েছেন। যেমন (১) ভক্তিকে জ্ঞান বা কর্মের বিরোধী বলে ব্যাখ্যাকরা হয়েছে; (২) নির্গুণ উপাসনার পরিবর্তে সগুণ উপাসনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; (৩) ভক্তি বলতে বিষ্ণুভক্তি বা কৃষ্ণভক্তির উপর গুরুত্বদিয়ে কৃষ্ণকে যিশু খ্রীষ্টের মতো করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। কৃষ্ণা শর্মা দেখিয়েছেন, কিভাবে পাশ্চাত্য পন্ডিতগণ বিশেষকরে উইলসন (Wilson) ওয়েবার (Weber) উইলিয়মস (Williams) এবং গিয়ারসন (Grierson) অত্যন্ত সচেতন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভক্তিকে এভাবে এক বিশেষধর্ম বা ভাব হিসেবে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে কৃষ্ণ পূজার জন্ম দিয়েছেন এবং ভারতের ঐতিহ্যকে ভ্রান্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

আমাদের আলোচনায় ভক্তি শব্দটিকে এক বিশেষ ধর্ম বা মত বা পূজাপদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার না করে সাধারণভাবেই ব্যবহার করা হয়েছে এবং একারণে ভক্তি, ধর্ম প্রভৃতি শব্দগুলির পরিবর্তে ভক্তি সাধনা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সামগ্রিক বিচারে মধ্যযুগ ধর্মীয় বিদ্রোহের যুগ এবং এই বিদ্রোহ শুধুমাত্র হিন্দুধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। মুসলমান ধর্মে সুফিবাদের মধ্যদিয়ে এই বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটেছে। হিন্দুধর্মের বহু শাখা প্রশাখার মধ্যে এই বিদ্রোহ প্রকাশিত হয়েছে সগুণ ভক্তি সাধনায় অথবা নির্গুণ ভক্তি সাধনায়। মতাদর্শ বা পূজার্চনার ব্যাপারে ভিন্নতা থাকলেও হিন্দু-মুসলমান ভক্তি সাধনার মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভক্তির অস্তিত্ব।

৩৬.৩.২ ভক্তিসাধনার মূল বৈশিষ্ট্য সমূহ

ভক্তি সাধনার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত, ভক্তি সাধনায় ভক্তের সঙ্গে স্রষ্টার বা ঈশ্বরের সম্পর্ক একান্ত ব্যক্তিগত। পুরোহিত বা যাজক এর ন্যায় কোনও মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তির দরকার হয় না।

দ্বিতীয়ত, স্রষ্টা বা ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্কের ভিত্তি হল ভক্তি; এই ভক্তি প্রধানত ভক্তের চৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে। আর এই ভক্তি-মিশ্রিত চৈতন্য রহস্যময়। একারণে এই সম্পর্কের কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাও দেওয়া যায় না।

তৃতীয়ত, এই স্রষ্টা বা ঈশ্বর নির্গুণ (নিরাকার) হতে পারেন আবার সগুণ (আকার) হতে পারেন। শঙ্করাচার্য বা নানকের ঈশ্বর নির্গুণ-সম্পন্ন কিন্তু চৈতন্য বা মীরাবাঈ এর ঈশ্বর সগুণসম্পন্ন।

চতুর্থত, ভক্তিসাধনা শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান বিরোধী এবং একারণে কর্মকান্ডের ও বিরোধী। অবশ্য কোনও কোনও ভক্তিসাধক পুরোপুরি কর্মকান্ডের বিরোধী ছিলেন না।

পঞ্চমত, সাধারণত জ্ঞানমার্গ বা সাধনাকে ভক্তিসাধনার পরিপন্থী বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই সরলী করণও সব সময় সঠিক নয়। অনেক ভক্তি সাধক একই সঙ্গে ছিলেন জ্ঞানমার্গী। এব্যাপারে শঙ্করাচার্যের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

ষষ্ঠত, ভক্তি সাধনায় জাতভেদ স্বীকার করা হয় না। একারণে ভক্তিআন্দোলন বর্ণাশ্রম-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন। এই বৈশিষ্ট্যও সবসময় সবার ক্ষেত্রে দেখা যায় না। যেমন তুলসীদাস জাতব্যবস্থাকে পুরোপুরি অস্বীকার করেন নি।

সপ্তমত, ভক্তিসাধনায় গুরুর এক বিশেষস্থান স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এই গুরু মধ্যস্থতাকারী পুরোহিত নন—তিনি পথপ্রদর্শক।

অষ্টমত, ভক্তি সাধনায় নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত; এব্যাপারেও বেশ কিছু অসংগতি দেখা যায়। যেমন কোনও কোনও ভক্তিসাধক কামিনী ও কাঞ্চনকে সাধনার প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখেছেন বা গৃহবিমুখ হয়েছেন। চৈতন্যদেবও এই সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

নবমত, সমাজজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ভক্তদের দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষণশীলতার পরিবর্তে উদার বলে মনে করা হয়। এই বৈশিষ্ট্যও সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

দশমত, ভক্তিসাধকগণ সাধারণত অনাড়ম্বর সহজ ও সরল জীবনবোধে বিশ্বাসী ছিলেন,

একাদশ, অধিকাংশ ভক্তি সাধকগণ বিশেষভাবে মহারাষ্ট্র, উত্তর ও পূর্বভারতের ভক্তি সাধকগণ সংস্কৃতের পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষাকেই মত প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

৩৬.৩.৩ ভক্তিআন্দোলনের উদ্ভবের কারণ

ভারতে মধ্যযুগে ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভবের কারণ সম্পর্কে পন্ডিতদের মধ্যে বেশ মতপার্থক্য দেখা যায়। একদল পন্ডিত মনে করেন, এই আন্দোলনের উদ্ভবের পিছনে রয়েছে বাইরে থেকে আসা কোনও উপাদান এবং এই উপাদানটি হ'ল ইসলাম। অর্থাৎ ইসলামের একেশ্বরবাদ ও সামাজিক সাম্যের ধারণা ভারতে ভক্তিআন্দোলন এর প্রসার ঘটিয়েছে। আর একদল তাত্ত্বিক রয়েছেন যাঁরা এই মতের বিরোধীতা করেন এবং মনে করেন ভক্তিআন্দোলনের উৎস ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই নিহিত। মার্কসীয় তাত্ত্বিকগন ভক্তিআন্দোলনের উদ্ভবের কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণে অগ্রসর হন। আমরা এই অংশে ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভবের কারণগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব।

৩৬.৩.৪ ভক্তিআন্দোলনের উদ্ভবের কারণ ঃ ইসলামের প্রভাব

তারাচাঁদ বা ইউসুফ এর মত ঐতিহাসিকগণ মধ্যযুগের ভারতে ভক্তিআন্দোলনের প্রসারে ইসলামের অবদানের উল্লেখ করেন। পন্ডিতগণ ইসলামের এই অবস্থানকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেন। ভক্তিআন্দোলনের উদ্ভবে ইসলামের ইতিবাচক প্রভাবকে আহম্মমদ শরীফ (১৯৯২) দুটি পর্বে ভাগ করেন। প্রথমপর্বটি অষ্টমশতকে দক্ষিণভারতে আরববিজয়কে কেন্দ্র করে এবং দ্বিতীয় পর্বটি একাদশ ত্রয়োদশ শতকে উত্তরভারতে তুর্কী বিজয়কে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে। আহমদ শরীফ এর মতে ৭১১ খ্রীঃ সেনানায়ক মুহম্মদ ইসলামের শাস্ত্রীয় সংস্কৃতি নিয়ে আসেন এবং এরই প্রভাবে শঙ্করাচার্য 'ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে আবিষ্কার করেন বিমূর্ত একক ব্রহ্মকে। ইসলামের একেশ্বরবাদের প্রভাবেই

শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মাধ্ব বা বল্লভাচার্য প্রমুখের চেতনায় এ আলোড়ন, চিন্তার এ উৎকর্ষ এবং মননের এ বিকাশ। আহমদ সরীফ অনিরুদ্ধ রায়ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় এবং সুরজিৎ দাশগুপ্ত তাঁদের বিভিন্ন রচনায় শঙ্করাচার্যের একত্ববাদেব উদ্ভবে ইসলামের অবদানের উল্লেখ করেন।

ইসলাম প্রভাবের দ্বিতীয় পর্বটি শুরু হয়েছে একাদশ-ত্রয়োদশ শতকে মামুদ (১০০১ খ্রীঃ থেকে ১০০৬ খ্রীঃ) মুহম্মদ ঘুরী (খ্রীঃ ১১৯০) কুতুবউদ্দিন আইবক (খ্রীঃ ১২০৬) কর্তৃক ভারত অভিযানকে কেন্দ্র করে। এসময়ে ইসলামের শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের পরিবর্তে মরমিয়া সুফি ঐতিহ্যই ছিল প্রধান। এই সুফি ভাবধারাই উত্তর ভারতে ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম কারণ। আহমদ শরীকের মতে, এই সুফি ভাবধারার প্রভাবেই উত্তরভারতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটে যা ভক্তিআন্দোলন নামে পরিচিত।

ভক্তি আন্দোলন ইসলামের প্রভাবে গড়ে উঠেছে এই মতের সমর্থনে যে সমস্ত যুক্তিগুলি দেখানো হয় তা নিম্নরূপ:

প্রথমত, হিন্দুধর্ম বহুত্ববাদে (বহু দেব-দেবীর অস্তিত্বে) এবং পৌত্তলিকতাবাদে বিশ্বাসী, পরিবর্তে ইসলামের একত্ববাদ এবং অপৌত্তলিকতা ভক্তিআন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য যা ভক্তি সাধকগণ ইসলাম থেকেই গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বাসী বা ভক্তের আবেগ, সরলতা ও ঈশ্বরের প্রতি নিজেকে উৎসর্গকরা ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভক্তি সাধনার ক্ষেত্রেও ভক্তের এই আবেগ, সরলতা, ত্যাগ প্রধান।

তৃতীয়ত, হিন্দুর ধর্মীয় জীবন পুরোহিততন্ত্র বা মধ্যস্থতাকারী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইসলামে, বিশেষত সুফি সাধনায়, ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের উপর জোর দেওয়া হয়। ভক্তি সাধনার ক্ষেত্রেও ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ।

চতুর্থত, ইসলামের সমাজ জীবন সাম্যের আদর্শে গঠিত। বিপরীতদিকে, হিন্দুসমাজ ব্যবস্থা জাত ব্যবস্থা নির্ভর, যেখানে প্রতিটি হিন্দুই জন্মসূত্রে কোন সুনির্দিষ্ট জাতের অন্তর্ভূক্ত। এই জাতগত অবস্থান ব্যক্তির কাজ ও সামাজিক মর্যাদাকে ঠিক করে দেয়। অর্থাৎ, জন্মসূত্রেই ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়গণ সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী এবং শূদ্র উপরোক্ত উচ্চজাত ভুক্ত ব্যক্তিদের সেবায় নিযুক্ত। প্রত্যেকেই এই জাতগত অবস্থান মেনে নেবে। কারণ, স্বধর্মে মৃত্যুও ভালো কিন্তু পরের ধর্ম (জাতকাজও আচরণ) ভয়াবহ। এভাবেই হিন্দুসমাজ নিম্নজাতের উপর উচ্চজাতভুক্ত ব্যক্তিদের প্রাধান্যকে বৈধতা দিয়েছে। ইসলামের সামাজিক সাম্যের ধারণাটি বিশেষ ছাপ ফেলে।

পঞ্চমত, ইসলামের দরবেশগণ বিশেষকরে মরমিয়া সাধক বা সুফি সন্তগণ যে অনাড়ম্বর জীবনযাপনের আদর্শ জনসমক্ষে তুলে ধরেন তার অবদান কম নয়। সুফিদরবেশদের জীবনের এই অনাড়ম্বর ঔদার্য সাধুতা, নিষ্ঠা ও মানবমুখী জীবন সাধারণ মানুষের জীবনই শুধু জয় করেনি ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রেও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। মধ্যযুগের ভক্তদের মধ্যে ও এই অনাড়ম্বর জীবনের ছবি পাওয়া যায়।

বেশ কিছু তাত্ত্বিক রয়েছেন যাঁরা ভক্তি আন্দোলনে ইসলামের ইতিবাচক প্রভাব এর পরিবর্তে নেতিবাচক প্রভাবের উপর অনেকে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। এই মত অনুযায়ী, হিন্দু সমাজকে ইসলামের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য অর্থাৎ ইসলামে দীক্ষিতকরণ রদ করার জন্য ভক্তি আন্দোলন, বিশেষ করে উত্তর ও পূর্বভারতে ভক্তি আন্দোলন গড়ে উঠেছে।

ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভবের কারণ হিসেবে ইসলামএর প্রভাবকে অনেক তাত্ত্বিকই অস্বীকার করেন। প্রথমেই যে প্রশ্নটি দেখা দেয় তা হল ইসলামের কোন্ ধারার এবং কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য বা উপাদানগুলির প্রভাব ভক্তিআন্দোলনের কারণ হিসেবে বিবেচিত হবে? ইসলামের উদ্ভবের কয়েক শতকের মধ্যেই ইসলামের বিভিন্ন ধারা লক্ষ করা যায়। ভারতে যখন ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে তখন ইসলাম প্রধানত দুভাগে যথা সুন্নি ও শিয়া মতবাদে বিভক্ত। শরিয়তি বা ঐতিহ্য অনুযায়ী ইসলামের বাইরে সুফি মতবাদ ভারতের মাটিতে অত্যন্ত সক্রিয়। যদি ধরে নেওয়া হয় সুফি মতবাদই ভক্তিআন্দোলনের প্রধান উৎস তাহলে সুফি মতবাদ কতদূর ইসলামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দেয়। কারণ রক্ষণশীলগণ সুফি মতবাদকে ইসলাম বিরোধী বলে মন্তব্য করেন। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ধারণা, ভক্তিসাধনা, প্রভৃতি ধারণাগুলি যা একান্তভাবে সুফি মতবাদ থেকে এসেছে বলে দাবী করা হয়, তা কতদূর গ্রহণযোগ্য সে সম্পর্কেও পন্ডিতগণ প্রশ্ন তুলেছেন। কারণ এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। দক্ষিণভারতে আলভার ও নায়ানার ভক্তি আন্দোলন ইসলামের উদ্ভবের আগেই সূচিত হয়েছে। বৌদ্ধদের মধ্যে, বিশেষকরে মহাযান বৌদ্ধগণ বুদ্ধকে অবতার বানিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়টি ইসলামের উদ্ভবের অনেক আগেই তুলে ধরেন। ভাগবত ঐতিহ্যে, দক্ষিণভারতে বীরশৈব আন্দোলনে ভক্তিসাধনাই প্রধান।

তৃতীয়ত, একেশ্বরবাদ এবং অ-পৌত্তলিকতা — ভক্তিআন্দোলনের এই দুই বৈশিষ্ট্যকে ইসলামের অবদান হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু শঙ্করাচার্যের দর্শনে একেশ্বরবাদ ও অ-পৌত্তলিকতা প্রধান যা পরবর্তীকালের ভক্তিসাধকদের প্রভাবিত করে। শঙ্করাচার্যের একেশ্বরবাদ এবং ইসলামের একেশ্বরবাদ এর মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট। ইসলামের একেশ্বরবাদ অন্য ঈশ্বর / দেবতাদের অস্তিত্বের বিরোধী কিন্তু শঙ্করাচার্যের একেশ্বরবাদ বহুঈশ্বরের মধ্যে সমন্বয়কারী অর্থাৎ একই ঈশ্বর বহুতে বিরাজমান বা বলা যায় বহু ঈশ্বর আসলে একই ঈশ্বরের প্রকাশ। শঙ্করাচার্যের এই ধারণা ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। অ-পৌত্তলিকতা শঙ্করার্যের ও আগে বৌদ্ধদের বক্তব্যে লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধগণ ঈশ্বর এবং পৌত্তলিকতা বিরোধী; শঙ্করাচার্য পৌত্তলিকতাবিরোধী কিন্তু ঈশ্বর বিরোধী নয়। শঙ্করাচার্যের এই অ-পৌত্তলিকতা বা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা শঙ্করাচার্যকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলে সাকারবাদীগণ বা পৌত্তলিকগণ সমালোচনা করেছেন। ভক্তি আন্দোলনের সকলেই পৌত্তলিক বিরোধী ছিলেন না। নানক, কবীর প্রমুখ ভক্তি সাধকগণ নির্গুণ ঈশ্বরের সমর্থক ছিলেন কিছু মীরাবাঈ বা চৈতন্যদেব ছিলেন সগুণ ঈশ্বরের সমর্থক।

চতুর্থত, মধ্যযুগের ভক্তদের সকলেই যে জাতব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিলেন তাও বলা যাবে না। তুলসীদাসের মতো অনেক ভক্তই জাতব্যবস্থা ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি টিকিয়ে রাখারই পক্ষপাতী ছিলেন। বিপরীতদিকে, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে ইসলামসম্প্রদায়ের মধ্যেও সামাজিক স্তরবিন্যাস ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। আরব রক্তের

প্রবাহ যার মধ্যে রয়েছে এরকম মুসলমান, অন্যান্য দেশ থেকে আগত মুসলমান, ভারতের ধর্মান্তরিত মুসলমান এবং ধর্মান্তরিতদের মধ্যে পূর্বতন জাত ব্যবস্থার অবস্থান প্রভৃতি বিষয়গুলি মুসলমান সম্প্রদায়কে সামাজিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেনি। এই সমস্ত কারণে অনেক তাত্ত্বিকই ভক্তি আন্দোলনকে ইসলামের প্রভাব থেকে উদ্ভূত এরকম মত স্বীকার না করে ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভবে অন্য কারণ সন্ধানে অগ্রসর হয়েছেন। অবশ্য এই সমস্ত তাত্ত্বিকদের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন যাঁরা মনে করেন ভারতের ভক্তি আন্দোলন ইসলামের দ্বারা বিশেষ করে সুফিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে — অবশ্য ভারতের মাটিতে ইসলামও প্রভাবিত হয়েছে ভক্তি আন্দোলনের দ্বারা। প্রায় একই সময়ে ঘটে যাওয়া দুইটি মরমীয়া সাধনার ধারা প্রবাহিত হতে যেয়ে পরস্পর পরস্পরকে যেমন প্রভাবিত করেছে একইভাবে প্রভাবিত ও হয়েছে। কিন্তু একটির উদ্ভবে অপরটি একমাত্র বা প্রধান ভূমিকা নিয়েছে এধরণের সিদ্ধান্ত টানা কষ্টকর। ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভব ভারতের সে সময়ের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর মধ্য থেকেই ঘটেছে।

৩৬.৩.৫ ভক্তিআন্দোলনের উদ্ভবের কারণ ঃ ভারতীয় ধর্মীয় ঐতিহ্য ও পরিস্থিতি

মধ্যযুগে ভারতে যে ভক্তি আন্দোলন দেখা যায় তার শিকড় ভারতের মাটিতেই প্রবিষ্ট ছিল বলে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেন। প্রতীক পূজার পরিবর্তে একেশ্বর বাদে বিশ্বাস ঋক বেদের মধ্যেই নিহিত ছিল এবং এই বিশ্বাস পরবর্তীযুগগুলিতেও বহুদেবদেবী পূজার পাশাপাশি বজায় ছিল। ভক্তি সাধকদের বক্তব্যের মধ্যে উপনিষদের বক্তব্যের ও সুর শোনা যায়। ইসলামের উদ্ভবের আগেই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেও অ-পৌত্তলিকতা, জাত ব্যবস্থার বিরোধীতা লক্ষ করা যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম থেকে দশম শতকের মধ্যে দক্ষিণভারতে যে বৈষ্ণব (আলবার) এবং শৈব (নায়নার) ভক্তি আন্দোলন গড়ে ওঠে তা একান্তই ভারতের মাটি থেকেই উঠে আসা আন্দোলন। মধ্যযুগের ভক্তি সাধকদের কৃতিত্ব হ'ল এই সাধকগণ ভক্তির বিশুদ্ধ ধারনা শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান ও গোষ্ঠীসংকীর্ণর্তায় উদ্ধে স্থাপন করেছিলেন এবং মুক্তির উপায় হিসেবে ঈশ্বরের প্রতি গভীর আকুতি ও অহৈতুকী প্রেমের ভূমিকাকে তুলে ধরেছেন। মধ্যযুগে যখন শাস্ত্রীয় ধর্ম ভাবনা শুষ্ক, জীবনহীন, স্থবির, আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব হয়ে উঠেছিল তখন ভক্তি সাধকদের আদর্শও জীবনবোধ মাটির কাছাকাছি মানুষদের প্রবল ভাবে নাড়া দেয়। এরই পাশাপাশি সুফিবাদের প্রসার ঘটতে থাকে। এব্যাপারে কোনসন্দেহ নেই যে সুফি ভাবধারার প্রভাব ভক্তি আন্দোলনেও পড়ে কিন্তু একটাও ঠিক যে সুফিসাধকগণও সেসময়ের ভারতীয় যোগসাধনায় নাথপন্থীদের ক্রিয়াকলাপ দ্বারা প্রভাবিত হন। এই পারস্পরিক প্রভাবের প্রকৃতি ও ব্যাপকতা নির্ণয় করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। এবং যতক্ষণ না তা হচ্ছে ততক্ষণ কোন এক পক্ষের প্রভাবকে বড় করে দেখানো সমীচীন নয়। তাছাড়া অন্যান্য উপাদানগুলিও আলোচনায় আনা দরকার।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র ও বলেন, এটা মেনে নিতে খুব একটা অসুবিধা হবার কথা নয় যে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে ভক্তিআন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে সেখানকার নিজস্ব ও নির্দিষ্ট পরিস্থিতি থেকেই। এই দুই আন্দোলনই ভারতীয় সংস্কৃতির্র বৃহত্তর প্রেক্ষাপটেই থেকেছে এবং দার্শনিক, নৈতিক ও সৌন্দর্যসংক্রান্ত ধারণাগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেছে। এমনকি, সতীশচন্দ্রের মতে, ষষ্ঠ থেকে দশম শতক পর্যন্ত দক্ষিণভারতে উদ্ভূত ও প্রসারিত ভক্তিআন্দোলন এবং চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নামদেব এর শুরু থেকে পঞ্চদশ শতকে কবীর, ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেব এর মধ্যে ভক্তিআন্দোলনের যে প্রকাশ ঘটেছে

তারও পিছনে রয়েছে যথাক্রমে দক্ষিণ, উত্তর ও পূর্বভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ভিন্ন ধারা। যেমন, দক্ষিণভারতে ভক্তিআন্দোলনের পিছনে ছিল বৌদ্ধ ও জৈন এবং স্মার্ত ব্রাহ্মণ বিরোধীতা এবং এর ফলে যাজক ব্রাহ্মণ্যবাদ এখানে প্রসারিত হবার সুযোগ পেয়েছে। বিপরীত চিত্রটি দেখা যায় উত্তর ভারতে, যেখানে ভক্তি আন্দোলন মূলত ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং এর পিছনে ছিল নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উদ্ভূত আত্মপরিচয়ের সংকটে সম্মুখীন কারিগর, বিভিন্ন বৃত্তিভোগী শ্রেণী যারা ব্রাহ্মণ্য জাতভিত্তিক কাঠামোয় শূদ্রের মর্যাদা পেয়েছে এবং যারা এই আন্দোলনে মূখ্য ভূমিকা নিয়েছে। অবশ্য এই আন্দোলনগুলি থেকে সতীশচন্দ্র এক সাধারণ সূত্রের সন্ধান করেন এবং তা আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি। যখন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তি খুবই প্রবল এবং আঞ্চলিক/স্থানীয় ভূস্বামী ও ব্রাহ্মণের প্রতাপ কম তখনই ভক্তি আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে; অপরদিকে যখন রাষ্ট্রশক্তি দূর্বল, স্থানীয়/আঞ্চলিক ভূস্বামীগণ অত্যন্ত সক্রিয় এবং রাষ্ট্রশক্তির বিকেন্দ্রীকরণে প্রশাসনিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী, ভূমিদানের মাধ্যমে ব্রাহ্মণের হাতে জমির এক বড় অংশের মালিকানা হস্তান্তরিত এবং বাণিজ্য, বিশেষ করে দূরপাল্লার বাণিজ্য এক সংকটের মুখে এবং নগর সভ্যতার ও সংকট দেখা দিয়েছে তখন ভক্তিআন্দোলন বিকশিত হবার অনুকূল পরিবেশ থেকে বঞ্চিত থেকেছে।

৩৬.৩.৬ ভক্তিআন্দোলনের উদ্ভব ঃ মার্কসবাদী তাত্ত্বিকগণের বক্তব্য

মার্কসবাদী তাত্ত্বিকগণ ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভবও বিকাশের সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের সম্পর্কটি উল্লেখ করেন। এই তত্ত্বে ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ককে তুলনা করা হয়েছে সামন্তপ্রভুর সঙ্গে ভূমিদাসের সম্পর্কের। এব্যাপারে ডি. ডি. কোশাম্বীর (D.D.Kosambi) নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কোশাম্বীর মতে, সামন্ত সমাজে সামন্তপ্রভূর প্রতি ভূমিদাসের আনুগত্য শর্তহীন; ভক্তিসাধনাতেও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের আনুগত্য শর্তহীন। রামশরণ শর্মাও কোশাম্বীর এই বিশ্লেষণকেই অনুসরণ করেছেন। এই ধরণের তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরেন কৃষ্ণা শর্মা (১৯৮৭) যাঁর মতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের আনুগত্যের বিষয়টি ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসের প্রতিটি পর্বেই লক্ষ করা যায়। ভারতে সামন্ত সমাজ গড়ে ওঠার (ভারতে সামন্ততন্ত্র আদৌ ছিল কিনা বা থাকলে ও তা ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্র থেকে কতটা ভিন্ন এব্যাপারে পন্ডিতগণ একমত নন) আগে প্রাচীন ভারত সম্পর্কে একথা যেমন সত্য, সামন্ত পরবর্তী পুঁজিবাদী ভারতীয় সমাজেও (একদল পন্ডিত রয়েছেন যারা ভারতীয় সমাজ বিশ্লেষণে সামন্ততন্ত্র, পুঁজিতন্ত্র প্রভৃতি ধারণাগুলিকে ইউরোপীয় 'নির্মাণ' বলে মনে করেন) তা একইভাবে সত্য। সুতরাং ভক্তি সাধনাকে শুধুমাত্র সামন্তসমাজের সঙ্গে একাত্ম করে দেখাটা যুক্তিযুক্ত নয়। তাছাড়া শঙ্করাচার্যের মতো নির্গুণ ভক্তগণ ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ককে একান্ত ব্যক্তিগত বলে মনে করেন এবং ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের একাত্মতার কথা বলেন।

ভক্তি আন্দোলনের বিশ্লেষণে মার্কসবাদী তাত্ত্বিকদের মধ্যে আর এক ধরণের প্রবণতা লক্ষ করা যায় এবং তা হ'ল ভক্তিআন্দোলনকে সেইসময়কার প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণের মানুষের বিদ্রোহ হিসেবে ব্যাখ্যা করা। এক্ষেত্রে বর্ণের (সাম্প্রতিক আলোচনায় বর্গের) সঙ্গে শ্রেণীর বিষয়টিকে সমার্থক মনে করা হয়েছে। একথা সত্য, এই আন্দোলনে যারা ব্যাপকভাবে সাড়া দেন তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নতুন সমাজ বিন্যাসে আত্মপরিচয়ে সংকটে সম্মুখীন বৃত্তি ভোগী গোষ্ঠীগুলি ও সাধারণ কৃষক, কৃষিশ্রমিক যাঁরা

অধিকাংশই ছিলেন শূদ্রজাতভুক্ত। এটাও ঘটনা যে, কবীর, দাদু, রুইদাস, নামদেব প্রমুখ ভক্তগণ ছিলেন নিম্নবর্ণের মানুষ। কিন্তু এটাও ঘটনা যে বেশ কিছু ভক্ত যেমন চৈতন্য, তুলসীদাস, সুরদাস ছিলেন উচ্চবর্ণের মানুষ। রামানুজ, নিম্বার্ক, মাধব ও বল্লভাচার্য ছিলেন উচ্চবর্ণে জাত। নির্গুণ ভক্তিসাধক নানক ও ছিলেন উচ্চজাত ভুক্ত (ক্ষত্রিয়)। সুতরাং ভক্তি আন্দোলনকে নিম্নবর্ণের মানুষের আন্দোলন হিসেবে ব্যাখ্যা করা একধরণের ব্যাখ্যার সরলীকরণমাত্র।

অপর এক মাকর্সবাদীতাত্ত্বিক ইরফান হাবিব ভক্তিআন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশকে আলোচনা করেছেন ইসলামের আগমনে উদ্ভূত নতুন শ্রেণীবিকাশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। ইরফান হাবিব এর মতে, ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতাদখলের ফলে শাসকগোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর জন্য শহরাঞ্চলে শিল্পী ও কারিগর শ্রেণীর প্রসার ঘটতে থাকে। এই নতুন শাসকগণ কর্তৃক নতুন নতুন চাহিদার ফলে নতুন ধরণের কারিগর ও দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন দেখা দেয়। নিম্নবর্ণের মানুষেরাই মূলত এই নতুন প্রয়োজনগুলি যোগানের জন্য এগিয়ে আসে এবং এর ফলে পুরানো জাতভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে নতুন জীবিকার সংঘাত দেখা দেয়। পুরানো জাত ব্যবস্থার নিয়মবিধিও ভঙ্গ হতে থাকে। এরকম অবস্থায় কবীর ও নানকের জাতব্যবস্থা বিরোধী আন্দোলন এই নতুন জীবিকা গোষ্ঠীগুলির কাছে মুক্তির উপায় হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এদের মধ্য থেকে বড় অংশ কবীর ও নানকের মতের অনুগামী হতে থাকে। শুধুমাত্র শহরাঞ্চলের নতুন শ্রেণীগুলিই কবীর ও নানকের জাতব্যবস্থাবিরোধী আন্দোলনের সমর্থক হয়ে ওঠেনি। গ্রামাঞ্চলে বিশেষকরে পাঞ্জাবের কৃষকদের মধ্যে 'জাঠ' সম্প্রদায়ের বড় অংশও এই আন্দোলনকে সমর্থন করেন। ইরফান হাবির এঁর মতে, এই জাঠগণ ছিলেন মূলত পশুপালক গোষ্ঠী যাঁরা পরে কৃষি গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হন। কিন্তু এই নতুন শ্রেণীতে রূপান্তরিত হবার পরেও অন্যান্য কৃষিজীবি জাতগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সমমর্যাদার প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি। স্বাভাবিক ভাবেই, একজন 'জাঠ' সম্প্রদায় ভুক্ত কৃষকের পক্ষে পুরাতন জাতব্যবস্থার নিম্নস্তরে অবস্থানের পরিবর্তে জাতভেদ মুক্ত এক সমাজের বাসিন্দা হওয়াই অধিকতর কাম্য। তাই এইজাঠদের মধ্যে কবীর ও নানকের মতের প্রসার ব্যাপক হয়ে ওঠে।

ইরফান হাবির এর এই ব্যাখ্যাকে সমালোচনা করে কৃষ্ণা শর্মা বলেন, ইরফান হাবিব ভক্তি আন্দোলনকে প্রতিবাদ ও শ্রেণীসংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু ভক্তি আন্দোলনের মূল বক্তব্যগুলির বিশদ মূল্যায়ন করেননি। তাছাড়া, কৃষ্ণা শর্মার মতে, ভক্তি সম্পর্কে ধারণার অস্পষ্টতা ও বিশ্লেষণ ইউরোপীয় বিশ্লেষণ অনুসারী হওয়ায় এক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। যেমন সগুণ ও নির্গুন ভক্তি আন্দোলন সম্পর্কে, দক্ষিণভারতের ও উত্তর ভারতের ভক্তি আন্দোলনের পার্থক্য সম্পর্কে এই ঐতিহাসিকগণ খুব একটা স্পষ্ট ধারণা দেননি।

অবশ্য ভক্তি আন্দোলনের বিশ্লেষণে মাকর্সবাদী তাত্ত্বিকগণের অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ভক্তি আন্দোলনের বিশ্লেষণকে শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক / ধর্মীয় আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এই আন্দোলনের পিছনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণগুলির অন্বেষণ নিঃসন্দেহে মার্কসবাদী তাত্ত্বিকগণের এক বড় অবদান। যে কোনও আন্দোলনের বিশ্লেষণে একরৈখিকতার পরিবর্তে বিশ্লেষণ বহুরৈখিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নতুবা আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণ সংকীর্ণ হতে বাধ্য।

৩৬.৪ দক্ষিণভারতে ভক্তি আন্দোলন

মধ্যযুগে ভারতে ভক্তি আন্দোলনের প্রথম বিকাশ ঘটে দক্ষিণ ভারতে এবং পরে তা সঞ্চারিত হয় মহারাষ্ট্র, উত্তর ভারতে এবং পূর্বভারতে। এব্যাপারে একটি গাথার উল্লেখ করা যেতে পারে —

উৎপন্ন দ্রাবিড়ে ভক্তির্বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা

ক্বচিৎ ক্বচিন্ মহারাষ্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ং গতা।

("ভক্তি উৎপন্ন হয়েছিল দ্রাবিড়ে, বৃদ্ধি পেয়েছিল কর্ণাটকে কিছু কিছু মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে লুপ্ত হয়েছে" — অনুবাদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (রচনা সংগ্রহ ৩য় খন্ড পৃঃ ৬৪৪।

দক্ষিণ ভারতে ভক্তি আন্দোলনের দুটি পর্ব লক্ষ করা যায়। প্রথমপর্বটি জড়িত খ্রীঃ ষষ্ঠ শতক থেকে নবম শতক পর্যন্ত 'আলবার' নামে বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও 'নায়নার' নামে শৈব সম্প্রদায়ের সঙ্গে। দ্বিতীয়পর্বটি জড়িত একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকে - শঙ্করাচার্যের (খ্রীঃ ৭৮৮-৮২০) অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে রামানুজ নিম্বার্ক মাধ্ব এর বক্তব্যের সঙ্গে। বল্লভাচার্য এই ধারারই প্রতিনিধি যিনি পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ভক্তি আন্দোলনের বিকাশে দক্ষিণভারতের সঙ্গে উত্তরভারতের সেতুবন্ধন ঘটান। দ্বিতীয় পর্বটি শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদী দর্শনের বিরুদ্ধ প্রতিবাদী ভক্তিবাদী আন্দোলন হিসেবে বর্ণনা করা হলেও, কৃষ্ণা শর্মার মতে, শঙ্করাচার্যও ভক্তিবাদী তাত্ত্বিক। কৃষ্ণা শর্মার মতে, শঙ্করাচার্যকে জ্ঞানমার্গী হিসেবে এবং জ্ঞানমার্গকে ভক্তিমার্গের বিরোধী হিসেবে গণ্য করে যে বক্তব্য সাধারণত হাজির করা হয় তা সঠিক নয়। শঙ্করাচার্যও ভক্তিবাদী এবং শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদে ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। শঙ্করাচার্য সম্পর্কে এই পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যার জন্য আমরা দ্বিতীয়পর্বের ভক্তি আন্দোলনের আলোচনায় শঙ্করাচার্যের মত সম্পর্কেও আলোচনা করব।

৩৬.৪.১ দক্ষিণভারতে ভক্তিআন্দোলন - প্রথমপর্ব

দক্ষিণভারতে ভক্তি আন্দোলনের প্রথম বিকাশ দেখা যায় ষষ্ঠ শতক থেকে নবম শতকে আলবার ও নায়নার গীতিকারদের রচনায়। আলবার গীতিকারদের ভক্তিমূলক গানগুলি তামিলসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। এই গানগুলি রচিত হয়েছে খ্রীঃ সপ্তম থেকে খ্রীঃ নবম শতক পর্যন্ত এবং যা 'নালাঈর প্রবন্ধম' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়। এই গ্রন্থটি সে সময়কার ভক্তি আন্দোলনের প্রকৃতিকে তুলে ধরে। গানগুলির রচয়িতা 'আলবার' ভক্তি সাধকগণ যাঁরা ছিলেন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। আলবার কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন পেরিআলবার, পেরিআলবারের কন্যা আন্দল, তিরুমঙ্গ আলবার, কুলশেখর আলবার এবং নামআলবার। এই ভক্তিগীতিগুলি সেসময় এতই জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে 'নালাঈর প্রবন্ধম'কে এক পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে দেখা হতে থাকে।

দক্ষিণভারতের প্রেমভক্তিমূলক এই গীতিকবিতাগুলির সৃষ্টির পিছনে বিভিন্ন কারণ হাজির করেছেন পন্ডিতগণ। ভি সুব্রামনিয়ম এর মতে, প্রাচীন তামিল সাহিত্যে বরাবরই এক যৌন প্রেমমূলক আবেগপ্রবণ ঐতিহ্য ছিল। এই প্রেম ভাবনার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। (এক) এধরনের প্রেম ছিল সাধারণ মানুষেরই উপজীব্য বিষয় এবং (দুই) এই প্রেমের সঙ্গে এক ধরণের বিশেষ রহস্যময়তা ছিল। কিন্তু খ্রীঃ দ্বিতীয়

শতকের পর থেকে এই ঐতিহ্যটি ক্রমশঃ আর্যসভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চাপা পড়তে থাকে এবং এরই বহিঃপ্রকাশ হিসেবে এই ধরণের প্রেমমূলক ভক্তিগীতিগুলি রচিত হয়।

আর একদল পন্ডিত রয়েছেন যাঁরা মনে করেন, সে সময় দক্ষিণভারতে বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব খর্ব করার জন্য বিষ্ণু উপাসনা চালু হয় এবং এর ফলে দক্ষিণভারতে ক্রমশঃ ভক্তিআন্দোলনের মধ্যদিয়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে।

তৃতীয় মতে, খ্রীঃ ষষ্ঠ শতকে দক্ষিণভারতে যে ভক্তিআন্দোলন দেখা যায় তা অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে গড়ে উঠেছে। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে দক্ষিণ ভারতের অর্থনীতিতে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বাণিজ্যব্যবস্থার সংকোচন ও নগর সভ্যতার সংকট অর্থব্যবস্থাকে মূলত কৃষিভিত্তিক করে তোলে। এসময় আবার মন্দির প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মণ যাজক ও মন্দির বিগ্রহকে জমিদান, দক্ষিণভারতে ব্যাপকভাবে ঘটতে থাকে। এভাবেই দক্ষিণভারতে সামন্ত অর্থব্যবস্থার গোড়াপত্তন শুরু হয়। কৃষিউদ্বৃত্তের উপর নির্ভরশীল শাসক ও যাজক সম্প্রদায় এর সঙ্গে উৎপাদক কৃষকের সম্পর্ক কী ধরণের হবে তারই তত্ত্বরূপ এবং সংস্কাররূপ পাই ভক্তিআন্দোলনে। ভক্তি আন্দোলনে ঈশ্বর এর সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং ভক্ত ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণকারী। অনুরূপভাবে, শাসকও যাজকের সঙ্গে উৎপাদক কৃষকের সম্পর্কও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং উৎপাদক কৃষক শাসক ও যাজকের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করবে। পরিবর্তিত এই সামন্ত অর্থব্যবস্থার অনুকূল সমাজসম্পর্ককে তুলে ধরা হয়েছে ভক্তি আন্দোলনে।

'আলবার' গীতিকবিতাগুলি থেকে ভক্তি আন্দোলনের যে বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে ওঠে তা নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত, প্রথমদিকের 'আলবার' কবিগণ বিষ্ণুকৃপা লাভ করার উপায় হিসেবে ঈশ্বরের বিষয়ে প্রকৃতজ্ঞান লাভের উপর জোর দেন। ঈশ্বর সম্পর্কে প্রকৃতজ্ঞানলাভ এবং সেই জ্ঞান সাধারণমানুষের কাছে প্রচার ছিল প্রথমদিকের আলবার সাধকদের বৈশিষ্ট্য। আলবার শব্দটির অর্থই হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যিনি ঈশ্বর সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেছেন। পরবর্তীকালের আলবারগন অবশ্য জ্ঞানের পরিবর্তে ঈশ্বরের প্রতি অন্ধভক্তি এবং পুরো আত্মসমর্পণ এর উপর জোর দেন। ঈশ্বরের করুণা লাভ মানুষের চরম লক্ষ্য, কারণ এই করুণালাভই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর সাধনায় গুরুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গুরুই ভক্তকে ঈশ্বরের করুণালাভের পথ দেখান।

তৃতীয়ত, সহজ ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন ভক্ত সাধকের কাম্য। কুলশেখর আলবার রাজপরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও রাজপরিবারের সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করেন। কুলশেখর আলবার এর মতে, বিষ্ণু থেকে দূরে থাকা মানুষের চেয়ে তিরূপতি পাহাড়ের পাখি হয়ে ঈশ্বরের কাছে থাকা অনেক কাম্য।

চতুর্থত, বংশকৌলিন্য বা জাত ব্যবধান এর পরিবর্তে সামাজিক সাম্যের উপর আলবারগণ গুরুত্ব দেন। ঈশ্বরের কাছে সব মানুষই সমান। সেই ঈশ্বর এক এবং সবার প্রভুস্বরূপ। এভাবে আলবারগণ একেশ্বরবাদেরও প্রচার করেন। বেশকিছু আলবারগানে জাতব্যবস্থাকে পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়নি। অধিকাংশ আলবার কবিই ছিলেন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ভুক্ত। শূদ্র হয়েও যিনি আলবার কবিদের মধ্যে বিশেষ স্থান দখল করেন তিনি হলেন নামআলবার। অত্যন্ত প্রভাবশালী কবি হয়েও নামআলবার জাতভেদকে মেনে নেন।

পঞ্চমত, আলবার কবিদের সঙ্গে সে সময়ে মন্দিরের যোগাযোগ ছিল অত্যন্তবেশী। দক্ষিণভারতে সে সময় বিভিন্নস্থানে মন্দির গড়ে উঠতে থাকে এবং মন্দিরকে কেন্দ্র করে এক ভূস্বামী যাজকশ্রেণী ও গড়ে ওঠে। আলবার কবিদের সঙ্গে এই বিষ্ণুমন্দিরগুলির সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। শ্রীরঙ্গম মন্দিরেই 'নালাঈর প্রবন্ধম' গ্রন্থটি সংকলিত হয়। এই মন্দিরগুলিতে শূদ্রজাতভুক্ত আলবারদের প্রবেশাধিকার ও ছিল নিষিদ্ধ।

ষষ্ঠত, আলবার গীতিকবিতাগুলি যেমন কৃষ্ণের জীবনী, বিশেষকরে কৃষ্ণের বাল্যকাল, রামচন্দ্রের জীবণীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, আবার বিরহ-যাতনা নিয়ে প্রেমের কবিতাও এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। প্রেমমূলক সম্পর্কই এই গানগুলির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়।

সপ্তমত, এসময়ের ভক্তি আন্দোলনে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ও স্মার্ত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরোধীতা যেমন লক্ষ করা গেছে, অপরদিকে বিষ্ণু উপাসনার মধ্য দিয়ে যাজক ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রসারও ঘটেছে। এই যাজক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসারে মন্দিরগুলির অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য।

অষ্টমত, ভক্তি আন্দোলনের মধ্যদিয়ে তামিল ও সংস্কৃতভাষার পারস্পরিক লেনদেন ঘটেছে। এই ভক্তি আন্দোলনের সূত্র ধরেই দ্বাদশশতকে কবি কম্বন তামিল রামায়ণের রচনা করেছেন। এসময় মহাভারত ও ভাগবত পুরাণের অনুবাদ ও হয়েছে তামিল ভাষায়। বৈষ্ণবধর্ম প্রসারে সংস্কৃতগ্রন্থগুলি যেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে, অপরদিকে দক্ষিণভারতীয় ভাবনা সংস্কৃতভাষা ও বৈষ্ণবধর্মকে কেন্দ্র করে গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে।

আলবার ভক্তি আন্দোলনের পাশাপাশি একই সময়ে দক্ষিণ ভারতে ভক্তি আন্দোলনের আর একটি ধারা লক্ষ করা যায়। এই ধারাটি পরিচালিত হয় নায়নারদের দ্বারা। নায়নার ভক্তি আন্দোলন খ্রীঃসপ্তম ও অষ্টমশতকে দক্ষিণভারতে ব্যাপকতা লাভ করে। আলবার ভক্তি আন্দোলন যেমন বিষ্ণু সাধকদের আন্দোলন, সেরূপ নায়নার ভক্তি আন্দোলন শিব-ভক্তদের আন্দোলন। নায়নারদের ভক্তিগীতিগুলি 'তেভারম্' এবং 'পেরিয় পুরানম্' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পেরিয়পুরানম গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছে একাদশ শতকে এবং এই গ্রন্থে ৬৩ জন নায়নার এর জীবনবৃত্তান্ত, গীতিকবিতা সংগৃহীত হয়েছে।

আলবার আন্দোলনের মতো নায়নার ভক্তি আন্দোলনেরও মূল বিষয় হোল ভক্তি এবং একেশ্বরবাদ, শিবের প্রতি অচলা ভক্তি এবং আত্মসমর্পণই মুক্তির একমাত্র উপায়। এই আন্দোলন ও মঠ-মন্দিরকেন্দ্রিক। যাজক ব্রাহ্মণ এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। আলবার আন্দোলনের মতো নায়নার আন্দোলন ও পরিচালিত হয়েছে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিরোধীতা থেকে। স্মার্ত বা শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণগণ ছিলেন এই আন্দোলনের লক্ষ্য। এসময় বিভিন্ন স্মৃতি গ্রন্থগুলিতে যেমন মনুস্মৃতি, বিষ্ণুস্মৃতি, উসানস সংহিতায় যাজক ব্রাহ্মণদের শুধুমাত্র হেয়ই করা হয়নি, বিভিন্ন ধর্মীয় কাজে অনুপ্রবেশ ও বন্ধ করা হয়। আলবার ও নায়নার আন্দোলনকারীগণ ব্রাহ্মণ্য এই স্মার্তধারার বিরোধীতা করেন এর মঠ-মন্দিরকেন্দ্রিক যাজক ব্রাহ্মণ ধারার সমর্থক হয়ে ওঠেন। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে নায়নারদের মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র ধারা লক্ষ করা যায়। নায়নারদের একটি গোষ্ঠী বহুত্ববাদ, পৌত্তলিকতাবাদে ও জাতব্যবস্থার বিরোধী ছিল। অপর গোষ্ঠীটি বহুত্ববাদের বিরোধী হলেও পৌত্তলিকতাবাদও জাতভেদকে মেনে নিয়েছিল। এই গোষ্ঠীটির সঙ্গে রাজনীতির সংযোগও ছিল খুব

বেশী। যাজক ও মঠ-মন্দিরগুলি জনগণের যে আনুগত্য লাভ করে তা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রকর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য হয়ে দাঁড়ায়।

আলবার আন্দোলনের মতো নায়নার আন্দোলনের ভাষাও আঞ্চলিক। 'তেভারম' ও 'পেরিয় পুরানম' গ্রন্থদুটিই তার প্রত্যক্ষপ্রমাণ। নায়নার ভক্তগণ ছোট ছোট ছন্দোবদ্ধ কবিতার আকারে তাদের ভক্তিদর্শনকে প্রকাশ করতেন। এগুলি কন্নড় সাহিত্যে 'বচন' নামে পরিচিত। প্রায় তিনশো বছর ধরে এরকম বহু 'বচন' রচিত হয়। এর মাধমে শিবের প্রতি ভক্তির বিষয়টি নায়নারগণ তুলে ধরেণ। দ্বাদশাতকে বাসব নামে এক শিবভক্ত এব্যাপারে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন এবং বীরশৈব বা লিঙ্গায়ত নামে এক সম্প্রদায় গড়ে তোলেন। এই সম্প্রদায়ও বিভিন্ন মঠপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক সাম্যের বিষয়টি তুলে ধরেন।

৩৬.৪.২ দক্ষিণভারতে ভক্তি আন্দোলন - দ্বিতীয় পর্ব

মধ্যযুগে দক্ষিণভারতে দ্বিতীয় পর্বের অর্থাৎ একাদশ-ত্রয়োদশ শতকের ভক্তিআন্দোলনের তাত্ত্বিক উৎস হিসেবে শঙ্করাচার্যের (খ্রীঃ ৭৮৮-৮২০ মতান্তরে খ্রীঃ ৫০৯-৫৪১) অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে রামানুজ (খ্রীঃ ১০১৭-১০৯৯) নিম্বার্ক (ত্রয়োদশ শতক) মাধ্ব (খ্রীঃ ১১৯৭-১২৭৬ মতান্তরে (খ্রীঃ ১১৯৮-১২৭৮) এবং বল্লভাচার্যের (খ্রীঃ ১৪৭৩-১৫৩১) যথাক্রমে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদ আশ্রিত ভক্তি সাধনাকে উল্লেখ করা যায়। এই ধরনের সিদ্ধান্তে ধরে নেওয়া হয় যে শঙ্করাচার্যের দর্শন অদ্বৈতবাদীদর্শন এবং শঙ্করাচার্য নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক, সেহেতু শঙ্করদর্শনে ভক্তিসাধনা অনুপস্থিত। কিন্তু রামানুজ, নিম্বার্ক, মাধ্ব ও বল্লভাচার্য - প্রত্যেকেই দেবতার অস্তিত্বে এবং দেবতার সঙ্গে ব্যক্তির তথা ভক্তের সম্পর্কে বিশ্বাসী। তাছাড়া, ধরে নেওয়া হয়, জ্ঞানও ভক্তিপথ সম্পূর্ণভাবে পরস্পর বিরোধী পথ। শঙ্করাচার্য জ্ঞানের মাধ্যমে মায়ামুক্ত হয়ে আত্মমুক্তি চান, অপরদিকে রামানুজ, নিম্বার্ক, মাধ্ব ও বল্লভাচার্য জগতকে মায়া হিসেবে না দেখে ঈশ্বরেরই প্রকাশ হিসেবে দেখেন এবং ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেতে চান।

কৃষ্ণা শর্মার মতে, শঙ্করাচার্যের সঙ্গে উপরোক্ত তাত্ত্বিকদের পরস্পর বিরোধী অবস্থানের ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত এবং এই ভ্রান্তি আসলে গড়ে উঠেছে ভক্তি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার উপর। শঙ্করাচার্যের ভূমিকা মূলত বহুধা বিভক্ত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হিন্দুদর্শন ও সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এক সমন্বয় সাধনের এবং এই সমন্বয়সাধনের জন্য তিনি অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনের আশ্রয় নিয়েছেন—যেখানে বহুদর্শন ও দেবতার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েও এই বহুমাত্রিকতাকে এক পরমসত্ত্বার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং পরমসত্ত্বাকে প্রকৃত সত্ত্বা/সত্য হিসেবে মেনে নিয়ে বহুমাত্রিকতাকে ভ্রান্তিজনিত জ্ঞান বা মায়া হিসেবে দেখেছেন। রামানুজ প্রমুখ তাত্ত্বিকগণের মূল লক্ষ্য হল, বিষ্ণু উপাসনাকে সুদৃঢ় করা এবং বিষ্ণুকেই পরম ব্রহ্ম হিসেবে জ্ঞান করা। সুতরাং শঙ্করাচার্য যেখানে সমন্বয়কারীর ভূমিকা নিয়েছেন, রামানুজ প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ এক বিশিষ্ট দেবতার (বিষ্ণুর) উপাসনার প্রসারে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু উভয়েই ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং সকলেই ভক্তির উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন। তফাৎ শুধু এই যে শঙ্করাচার্য যেখানে নির্গুণ ভক্তিতে

বিশ্বাসী, রামানুজ সেখানে সগুণভক্তিতে বা বিষ্ণুভক্তিতে বিশ্বাসী। উভয় ক্ষেত্রেরই উৎস হল বেদান্তদর্শন— শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ প্রসারের ফলে কোনও বিশেষ দেবতার পূজার গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। বৈষ্ণবগণ সচেষ্ট হন শঙ্করাচার্যের এই দর্শনের বিরুদ্ধে সগুণভক্তিকে সুরক্ষিত ও যুক্তগ্রাহ্য করে তুলতে। এমনকি এর জন্য শঙ্করাচার্যকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলে অভিযুক্তও হতে হয়েছে।

বস্তুত, শঙ্করাচার্য সে সময়কার বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি নাস্তিক গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে আস্তিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে তৎপর হন। আস্তিকগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও সকলেই বেদ ও ঈশ্বরের চরম সত্ত্বায় বিশ্বাসী। শঙ্করাচার্য তাই আস্তিক গোষ্ঠীগুলির ভিন্ন ভিন্ন দর্শন ও ভাবকে একই চরমসত্ত্বার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি বেদান্তদর্শনের উপর নির্ভর করেন, যদিও বৌদ্ধদের মায়াবাদ, অ-পৌত্তলিকতা, সংঘের ধারণা দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তাছাড়া, সেসময়কার আলবার ও নায়নার ভক্তি আন্দোলনের একেশ্বরবাদ ও শঙ্করাচার্যকে প্রভাবিত করে।

শঙ্করাচার্য উত্তর-মীমাংসার জ্ঞানকাণ্ডকেই বেদান্ত হিসেবে বা বেদের লক্ষ্য ও পরিণতি ব্যাখ্যা করেন এবং এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ব্রহ্মকে একমাত্র বেদান্তদ্বারাই জানা যাবে। অথচ বিভিন্ন আস্তিকবাদী সম্প্রদায়গুলি এই ব্রহ্মকে ভিন্ন ভিন্নভাবে দেখে থাকেন। এর থেকে অনেকেই সিদ্ধান্ত করেন যে শঙ্করাচার্য জ্ঞানমার্গী। কারণ, জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি ব্রহ্মকে জানতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শঙ্করাচার্যের জ্ঞান ভক্তিবিরোধী নয়; আবার রামানুজ, মাধ্ব ও বল্লভাচার্য জ্ঞানকে উপেক্ষা করেননি। এখানে সকলেই জ্ঞান বলতে বুঝিয়েছেন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাপ্ত উপলব্ধি বা ধারণাকে। 'বিবেক চূড়ামণি' গ্রন্থে শঙ্করাচার্য ভক্তিকে কোনও ব্যক্তির স্ব স্বরূপের প্রতি অন্বেষণ বলে সংজ্ঞায়িত করেন। এই ধারণা ও শঙ্করাচার্য পেয়েছেন তাঁর আগের দার্শনিকদের কাছ থেকে। শঙ্করাচার্যের আগে আলবার ভক্তি আন্দোলনকারীগণও জ্ঞানের মাধমে ঈশ্বর অন্বেষণে বা স্বরূপ সন্ধানে এগিয়েছিলেন। শঙ্করাচার্যও মনে করেন, আত্মার এই অন্বেষণই আত্মজ্ঞানের বা মুক্তির/মোক্ষের কারণ। সাধনা হোল সেই বিশ্বাস যার মাধ্যমে অন্বেষণের সূচনা হয়। যোগ হ'ল কার্যকরী ইচ্ছা আর ভক্তি হল আত্মাকে অন্বেষণের আকুতি বা আবেগ। সুতরাং, আত্মার অন্বেষণে ভক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভক্তি যা প্রথমদিকে আত্ম অন্বেষণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে সেই ভক্তিই আত্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানলাভের পরম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। একারণে জ্ঞাননিষ্ঠাই ভক্তির চরম আকার। সুতরাং জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। শঙ্করাচার্যের ভক্তি যেখানে নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতি, রামানুজের ভক্তি সগুণ ব্রহ্মরূপী বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি।

শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদে জ্ঞান ও ভক্তির পরস্পর নির্ভরশীলতার বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে যদি আমরা ভক্তি ও উপাসনা সম্পর্কে শঙ্করাচার্যের বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করি। ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে শঙ্করাচার্য ভক্তি বলতে নির্গুণ ব্রহ্ম এবং উপাসনা বলতে সগুণ ব্রহ্মের প্রতি আবেগ বা আকুতিকে বুঝিয়েছেন। উপাসনা হল সগুণভক্তি বা পূজার্চনা যা মানুষকে চরম সত্ত্বার কাছে (সমীপতা ও সালোকতা) নিয়ে যায়। ভক্তি সেখানে মানুষকে চরমসত্ত্বাকে উপলব্ধি করতে এবং সেই চরমসত্ত্বায় বিলীন হতে (সাযুযতা ও স্বরূপতা) সাহায্য করে এবং এই আত্মজ্ঞানই মুক্তি বা মোক্ষলাভে সহায়ক হয়। জ্ঞান শব্দটিকে শঙ্করাচার্য

দুটি অর্থে ব্যবহার করেন। (এক) জাগতিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান যার অধিকারীকে তিনি বিদ্বান বলেছেন। (দুই) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে আত্ম বা ব্রহ্মজ্ঞান (ব্রহ্মানুভব) যার অধিকারীকে মহাত্মন বলেছেন। শঙ্করাচার্যের কাছে শেষোক্ত জ্ঞানই হ'ল প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠজ্ঞান যা কোন মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি বা গ্রন্থের সাহায্যে লাভ করা যায় না। শাস্ত্রগ্রন্থ ধর্মের কার্যকরী দিক সম্পর্কে জ্ঞানলাভে সহায়তা করতে বা পথ দেখাতে পারে কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান একমাত্র লাভ করা যায় ব্যক্তিগতভাবে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। এভাবে তিনি শ্রেষ্ঠজ্ঞানকে বলেছেন ব্রহ্মানুভব এবং এই জ্ঞাননিষ্ঠাকে বলেছেন শ্রেষ্ঠভক্তি।

রামানুজ (খ্রীঃ ১০১৭-১০৯৯) এর ভক্তিভাবনায় বেদান্ত এবং বৈষ্ণব ভাবধারা — উভয়েরই অবস্থান দেখা যায়। বেদান্তের দ্বারা প্রভাবিত রামানুজ জ্ঞান, ধ্যান ও যোগের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। অপরদিকে বৈষ্ণব ভাবধারা প্রভাবিত রামানুজ বৈষ্ণবদের পূজাপদ্ধতি ও পৌত্তলিকতাকে স্বীকার করেছেন। তাঁর দর্শনে একদিকে যেমন দেখা যায় ধ্যান ও যোগের মাধ্যমে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আত্ম অনুসন্ধান তথা জ্ঞানলাভ বা ব্রহ্মকে জানা; অপরদিকে দেবতা তথা বিষ্ণুর প্রতি পুরোপুরি আত্মসমর্পণের মাধ্যমে মুক্তিলাভ। কৃষ্ণা শর্মার মতে, রামানুজের বক্তব্যের এই পরস্পর বিরোধীতা থাকলেও সামগ্রিক বিচারে তিনি আত্মানুসন্ধান তথা জ্ঞানের উপর জোর দিয়েছেন বেশী এবং আত্মানুষ্ঠান প্রচেষ্টাকে তিনি ভক্তি বলে উল্লেখ করেছেন এবং দেবতার প্রতি আত্মসমর্পণকে শুধুমাত্র বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীলতা বলেছেন। অপরদিকে, চিন্ময়ী চ্যাটার্জীর বক্তব্য হ'ল, রামানুজ শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মজ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তির পরিবর্তে বিশ্বাস এবং ভক্তির উপরই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। ভাস্কর এবং যমুনাচার্যের দ্বারা প্রভাবিত রামানুজ ভক্তিকেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন এবং মুক্তির একমাত্র পথ বলেছেন।

বস্তুত, রামানুজ দু'ধরণের সাধনার কথা বলেছেন ভক্তিসাধনা এবং প্রপত্তি বা সমর্পণ। ধ্যান, জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতা ভক্তিসাধনার বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে কোন দেবতার প্রতি সমর্পণ হ'ল প্রপত্তি। এই উভয়ধরনের সাধনার জন্য তিনি ব্যক্তি প্রকৃতির উপর নির্ভর করেছেন এবং যে সময়কার সমাজ যেহেতু জাতভিত্তিক সমাজ সেহেতু ভক্তিকে সমাজের উপরতলার তিন জাতের জন্য (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) এবং প্রপত্তিকে নিচে অবস্থানকারী শূদ্রদের জন্য উপযুক্ত বলেছেন। এখানে তিনি জাতিভেদকেই সমর্থন করেছেন এবং বিভিন্ন জাতের মুক্তির জন্য ভিন্ন পথের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু রামানুজের বক্তব্যে ভক্তিকে জ্ঞানের বিরোধী বলে উল্লেখ করা হয়নি; বরঞ্চ জ্ঞানকে ভক্তির জন্য অপরিহার্য বলেই বিবেচনা করা হয়েছে। তিনি শঙ্করাচার্যের অদ্বৈততত্ত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত যেখানে নির্গুণ, রামানুজের অদ্বৈত সেখানে সগুণ—বিষ্ণু। একারণে রামানুজের কাছে এ জগত মায়া বা ভ্রান্তি নয় — সেই অদ্বৈতেরই অংশস্বরূপ।

শঙ্করাচার্য এমনকি রামানুজ এর বক্তব্যের ভিন্ন বক্তব্য লক্ষ করা যায়, মাধ্ব (খ্রীঃ ১১৯৮-১২৭৮ মতান্তরে ১১৯৭ থেকে ১২৭৬) এর বক্তব্যে। দ্বৈতবাদী মাধ্ব শঙ্করাচার্যের আত্মা (জীব) এবং ব্রহ্ম (পরমাত্মার) এর সমন্বয়ের পরিবর্তে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় এবং পৃথক অস্তিত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। রামানুজ ব্রহ্ম, আত্মা এবং বস্তু (অচিৎ) এর মধ্যে যে অচ্ছেদ্য বন্ধনের যথা বলেছেন মাধ্ব তার ও বিরোধীতা করেন। মাধ্বের কাছে ব্রহ্ম বা চরমসত্ত্বা এবং আত্মা — উভয়ই পৃথক এবং স্বগুণসম্পন্ন। এক কথায়, ব্রহ্ম এবং আত্মা শঙ্করাচার্যের কাছে একাত্ম, রামানুজের কাছে অবিচ্ছিন্ন কিন্তু মাধ্বের কাছে

পৃথক ও স্বগুণ সম্পন্ন। এমনকি, মাধ্বের জীব (আত্মা) ব্রহ্ম এর ন্যায় সৎ, চিৎ এবং আনন্দস্বরূপ। ভক্তির উদ্দেশ্যই হ'ল ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের প্রকৃত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা এবং এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলেই ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের প্রসাদলাভ করা যায়। ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর বা ব্রহ্মের প্রসাদলাভই মাধ্বের কাছে প্রধান বিষয় যদিও তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ বা প্রকৃত জ্ঞানের প্রতি ব্যক্তি প্রচেষ্ঠাকে অস্বীকার করেন নি।

নিম্বার্ক (ত্রয়োদশ শতক) দৈত্বাদ্বৈত (দ্বৈত + অদ্বৈত) বাদী হিসেবে পরিচিত। তিনি একদিকে যেমন শঙ্করাচার্য ও রামানুজের মতো অদ্বৈততত্ত্বে বিশ্বাসী, অপরদিকে মাধ্বের মতো দ্বৈতসত্ত্বায়ও বিশ্বাসী। এককথায় বলা যায়, তিনি দ্বৈত একাত্মবাদী অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং আত্মার (জীব) এর মধ্যে ঐক্য ও অনৈক্যে বিশ্বাসী। রামানুজ বা মাধ্বের মতো নিম্বার্ক ব্রহ্ম, আত্মা এবং বস্তুর উল্লেখ করেন এবং জীব ও বস্তুকে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব হিসেবে না দেখে সবার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্বীকার করেন। কিন্তু একই সঙ্গে জীব বা বস্তুজগতকে ঈশ্বরের অংশ হিসেবে ব্যাখ্যা করে ঈশ্বরের অবিচ্ছন্ন সত্ত্বাকে তুলে ধরেন। ভক্তির চরম লক্ষ্য হোল সেই চরমসত্ত্বা বা ব্রহ্মকে জানা বা বলা যায় ব্রহ্মের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ব্রহ্মার সঙ্গে একাত্মহওয়াই জীবের চরম লক্ষ্য এবং এব্যাপরে প্রয়োজন হল চিন্তনও গভীর অনুরক্তি বা ঈশ্বর ভক্তি। এই ভক্তিই ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেতে সাহায্য করে এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ বা প্রসাদ পেলে মানুষ মুক্তি লাভ করে।

বল্লভাচার্য (খ্রীঃ ১৪৭৩-১৫৩১) এর বেদান্তদর্শন শুদ্ধাদ্বৈত (শুদ্ধ + অদ্বৈত) দর্শন নামে পরিচিত। শঙ্করাচার্য গোটা বিশ্বজগৎকে এক (অদ্বৈত) ব্রহ্ম হিসেবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দৃশ্যত বা বাহ্য জগৎকে মায়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। শঙ্করাচার্যের মতো বল্লভাচার্যও অদ্বৈতভাবে বিশ্বজগৎকে ব্যাখ্যা করেছেন শঙ্করাচার্যের মায়া বাদকে প্রত্যাখ্যান করে। বল্লভাচার্যের মতে, সবকিছুই যদি ব্রহ্ম হয় তাহলে তারই অংশ প্রতিবিম্বকে মায়া বলার কোনও কারণ নেই। সুতরাং, এ জগৎ মায়া বা অলীক নয়; বরঞ্চ বলা চলে ব্রহ্মেরই স্বাভাবিক প্রবাহ বা সৃষ্টি। ঈশ্বর যদি সমগ্র হন তাহলে মানুষ হোল ঈশ্বরেই অংশ। ঈশ্বর হলেন অন্তর্যামী যিনি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অবস্থান করেন।

বল্লভাচার্যের মতে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই প্রকৃতি অনুযায়ী ঈশ্বরভাব ও দানবভাব কাজ করে। যার মধ্যে দানবভাব কাজ করে তার পক্ষে সাধনার পথে যাওয়া অসম্ভব; কিন্তু ঈশ্বরভাবাপন্ন মানুষ ভক্তি সাধনায় সক্ষম। এই ঈশ্বরভাবাপন্ন মানুষ ও দু'ধরনের। একদল আছেন যারা মর্যাদাভক্তির পথ অনুসরণ করেন এবং অপর দল পুষ্টিভক্তির পথ অনুসরণ করেন। মর্যাদাভক্তি ও পুষ্টিভক্তি হ'ল ভক্তিরই দুই ধরন। মর্যাদাভক্তি অক্ষর ব্রহ্ম তথা বা নির্গুণ ভক্তি এবং পুষ্টিভক্তি হল সগুণ বা পুরুষোত্তম এর প্রতি ভক্তি। বল্লভাচার্যের কাছে মর্যাদাভক্তি জ্ঞান বা আত্মঅন্বেষণ নির্ভর অপরদিকে পুষ্টিভক্তি সগুণ তথা বিষ্ণুর প্রতি প্রেম নির্ভর। যাঁরা মর্যাদাভক্তির পথ অনুসরণ করেণ তাঁরা জ্ঞান এবং কর্মের উপর নির্ভরশীল এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অর্থাৎ আত্ম অনুসন্ধানের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করেন। যাঁরা পুষ্টিভক্তির পথ অনুসরণ করেন তাঁরা অবশ্যই ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করবেন; কারণ ঈশ্বরের করুনালাভ হলেই মানুষের মুক্তি ঘটে। বলাবাহুল্য, এই দুই ভক্তির মধ্যে বল্লভাচার্য শেযোক্ত পুষ্টিভক্তিকেই সমর্থন করেছেন; কারণ তাঁর কাছে বিষ্ণুই হলেন সর্বোত্তম ঈশ্বর।

৩৬.৫ ভক্তিআন্দোলন — মহারাষ্ট্র

মধ্যযুগে দক্ষিণভারতের পরেই যেখানে ভক্তি আন্দোলনের প্রাবল্য দেখা যায় তা হ'ল মহারাষ্ট্র। বস্তুত, ভক্তি আন্দোলন বলতে যা বোঝায় তার বিকাশ মহারাষ্ট্রেই। দক্ষিণভারতে ভক্তি আন্দোলনে ব্রাহ্মণ্য প্রাধাণ্য, জাতব্যবস্থাকে মেনে নেওয়া এবং মন্দির কেন্দ্রিকতা ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে, মহারাষ্ট্রের ভক্তি আন্দোলনকারীদের অধিকাংশই ছিলেন নিম্নজাতভুক্ত এবং আন্দোলনে জাতভেদ এর বিরোধী বক্তব্যই প্রকাশিত হয়েছে। এই আন্দোলনের সূচনা ত্রয়োদশ শতকে এবং পথিকৃৎ হলেন ভক্তকবি জ্ঞানেশ্বর (খ্রীঃ ১২৭১-৯৬) যিনি জ্ঞানদেব নামেও পরিচিত। জ্ঞানদেব সংস্কৃতের পরিবর্তে আঞ্চলিক মারাঠী ভাষাকেই বক্তব্যপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন এবং লোকশ্রুতি অনুযায়ী, মাত্র ১৫ বছর বয়সেই 'ভাবার্থ দীপিকা' নামে ভগবতগীতার একটি টীকা রচনা করেন। গ্রন্থটি জ্ঞানেশ্বরী নামে ও পরিচিত। পারিবারিক সূত্রে জ্ঞানদেব নাথপন্থী এবং রামানন্দসম্প্রদায়ের দর্শন সম্পর্কে পরিচিত হন। তাঁর পিতামহ ছিলেন নাথপন্থী এবং পিতা ছিলেন রামানন্দের শিষ্য। জ্ঞানেশ্বরের রচনায় একারণে নাথপন্থী এবং রামানন্দের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। এছাড়া, তিনি সে সময়কার জনপ্রিয় 'ভারকরি' সম্প্রদায় দ্বারাও প্রভাবিত হন। নাথপন্থীদের একেশ্বরবাদের ধারণা অপরদিকে ভারকরি সম্প্রদায়ের দেবতা 'বিথোবা'র পূজাপদ্ধতি, রামানন্দের ভক্তিদর্শন জ্ঞানদেবকে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

জ্ঞানদেব যদিও কৃষ্ণের উপাসক তথাপি তিনি শিব অথবা যে কোন সাকার অথবা নিরাকার উপাসনার কথাও বলেছেন। জ্ঞানেশ্বরের মতে, বিভিন্নমানুষ একই ঈশ্বরের পূজা করে বিভিন্ন দেবতার নামে। যে কোনও দেবতার পূজাই আসলে সেই চরম সত্ত্বাসম্পন্ন ঈশ্বরেরই পূজা তাই জ্ঞানেশ্বরের কাছে ভক্তের মন ও ভক্তি-অনুভূতিই প্রধান। প্রার্থনার মাধ্যমে ভক্ত সংসারজীবনের দুঃখ যন্ত্রণার লাঘব করে। ধনী-দরিদ্র, উচু-নিচু জাতের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। সকলের স্বর্গসুখের দ্বার উন্মুক্ত করে। এমনকি, একজন ভক্ত সূর্যের চেয়েও বড় কারণ সূর্য শুধুমাত্র দিনে আলো বিতরণ করে। কিন্তু একজন ভক্ত সব সময়কেই আলোকিত করে। একজন ভক্তের হৃদয় সিংহের মতো শক্ত আবার বিহঙ্গের মতো মুক্ত। নদী যেমন সমুদ্রের দিকে ছুটে যায় উচ্ছ্বলগতিতে এবং অবশেষে সমুদ্রতরঙ্গের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, ভক্তসেরকম ঈশ্বরের দিকে আনন্দে ধাবিত হয় এবং ঈশ্বরে বিলীন হয়। জ্ঞানদেব ভক্তের জীবনে গুরুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও বলেন। তাঁর মতে,গুরুর দায়িত্ব ও ভক্তের কর্তব্য ঈশ্বর সাধনার অন্যতম অঙ্গ। আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার, বারবার ঈশ্বরের নামকীর্তন, গ্রামীন সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা থেকে উদাহরণ-উপমার সাহায্যে ধর্মকে ব্যাখ্যা করা সাধারণ মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করে।

জ্ঞানদেব এর সমসাময়িক আর এক ভক্তি সাধক হলেন নামদেব (খ্রীঃ ১২৭০-১৩৫০) যিনি জীবিকায় ছিলেন সাধারণ একজন দর্জ্জি। নামদেবকে ঘিরে অন্যান্য যেসব ভক্তিসাধকগণ সে সময় সমাজে বিশেষ প্রভাব ফেলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন শূদ্রজাত ভুক্ত। যেমন গোরা ছিলেন কুমোর, সম্বতা ছিলেন মালী, চোখা জাতে অস্পৃশ্য, সেনা জাতে নাপিত। জ্ঞানেশ্বরের মতো নামদেব এর ও উপাস্যদেবতা হলেন

বিথোবা এবং তিনিও ছিলেন ভারকরি সম্প্রদায়ভুক্ত। অত্যন্ত সহজ সরল জীবনযাত্রা, সংসারের মধ্য থেকে ভক্তিভরে ঈশ্বরের তথা বিথোবার সাধনা, বছরে দুবার পন্ধরপুরে বিথোবার মন্দির দর্শন—এসবই ছিল নামদেব ও তাঁর সম্প্রদায়ের ভক্তিসাধনার অঙ্গ। জ্ঞানেশ্বরের মতো নামদেবও ছিলেন জাতব্যবস্থার বিরোধী এবং একারণে সাধারণ মানুষের, যাদের অধিকাংশই শূদ্রজাতভুক্ত, কাছে নামদেব ও ছিলেন খুব প্রিয়।

নামদেব এর মৃত্যুর পর প্রায় দুশো বছর ধরে মহারাষ্ট্রে কোন ভক্তসাধকের নাম সেরকম শোনা যায়নি। জর্ডেন্স (Jordens) এর মতে, ভারতে তুর্কী আক্রমন ও ইসলামের আগমনের ফলে এই ভক্তিআন্দোলন গুপ্তভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। পন্ধরপুরের ধ্বংস হলেও মানুষের ভক্তি বিশ্বাসকে ধ্বংস করা যায়নি। প্রায় দুশো বছর পর সাধক একনাথ (খ্রীঃ ১৫৩৩-১৫৯৯) ভক্তি আন্দোলনের এই ঐতিহ্যকে পুনরায় স্থাপন করেণ। একনাথ এক ভক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। তিনি জ্ঞানেশ্বরের 'ভাবার্থদীপিকা' গ্রন্থটির সংস্করন প্রকাশ করেন এবং রামায়নের উপর টীকা লেখেন। ভাগবত পুরানের উপর টীকা ও তাঁর বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। কোন প্রতিষ্ঠান বা সংঘসংগঠনের মধ্যে না গিয়েও যে মানুষ ঈশ্বর ভজনার মাধ্যমে মুক্তিপেতে পারে সে কথাই একনাথ তুলে ধরেন এই সমস্ত রচনার মাধ্যমে। মহারাষ্ট্রে রাম ভাবনাকে জনপ্রিয় করে তোলেন একনাথ।

অবশ্য মহারাষ্ট্রে ভক্তি সাধকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় হলেন সাধক তুকারাম (খ্রীঃ ১৫৯৮-১৬৫০)। তিনি ছিলেন গ্রামের এক সাধারণ কৃষি (মতান্তরে শস্য ব্যবসায়ী) পরিবারের সন্তান। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল দুঃসহ। খুব একটা আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। তাছাড়া, দুর্ভিক্ষে তাঁর পুত্র এবং দুই স্ত্রীর মধ্যে এক স্ত্রী মারা যান। দ্বিতীয় স্ত্রীর সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারনা ছিল না। ঈশ্বরের সাধনার মধ্যে দিয়েই তিনি আনন্দের পথ খুঁজতে প্রয়াসী হন। কারণ, তুকারামের মতে, ঈশ্বর ও তার মাঝে বিরোধের প্রাচীর তোলার কেউ নেই। জ্ঞানেশ্বর বা নামদেব এর মতো সাধক তুকারাম ও ভারকরি সম্প্রদায়ভুক্ত এবং দেবতা বিথোবার উপাসক। তাঁর ভক্তিগীতিগুলি এক চরম প্রেমময় সত্ত্বার কাছে ভক্তের আকুতিই প্রকাশ। জনশ্রুতি অনুযায়ী, তুকারামের আর্থিক দুরবস্থার কথা ভেবে শিবাজী বেশ কিছু উপঢৌকন পাঠান। কিন্তু তুকারাম তা নিতে অস্বীকার করেন। কারণ, তাঁর কাছে সোনা এবং মাটি দুইই সমান; যেহেতু তাঁর মোহ এবং আকাঙ্খা দুর হয়েছে। একথা শুনে শিবাজী তুকারামকে আমন্ত্রণ জানান কিন্তু তুকারাম সেই আমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে যে তুকারামের কাছে পিঁপড়ে এবং সম্রাট দুই সমান। এতে শিবাজী ক্ষুব্দ হবার পরিবর্তে নিজে তুকারামের বাড়িতেই মাঝে মাঝে এসে নাম কীর্তনে যোগ দিতেন।

তুকারামের এই ভক্তিসাধনা, বলা বাহুল্য রক্ষণশীল হিন্দুদের অপমানের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। রক্ষণশীলদের প্রতিনিধি রামেশ্বর ভট্ট তুকারামের গানগুলিকে ইন্দ্রয়নী নদীতে নিক্ষেপ করতে হুকুম দেন। লোকশ্রুতি অনুযায়ী, তুকারাম এগারদিন উপবাসে কাটান এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন (পরবর্তীকালে গান্ধীজীকেও অনুরূপ কাজ করতে দেখা যায়) গানগুলিকে রক্ষা করতে। ঈশ্বর অবশেষে এক যুবকের বেশে গানের পাণ্ডুলিপি তুখারামের হাতে অক্ষতঅবস্থায় দিয়ে যান। এই রামেশ্বর ভট্ট পরে তুকারামের ঘনিষ্ট শিষ্যে পরিণত হন। রামেশ্বর ভট্ট তুকারামের সম্পর্কে বলেন, যতো বড় জ্ঞানী, বেদজ্ঞ মানুষ হোক না

কেন সেই তুমি কোনভাবেই তুকারামের সমান নয়। তুকারাম ঈশ্বরকে এতই ভালবাসেন যে তার শব্দ থেকে শুধুই অমৃত ঝরে পড়ে। তুকারাম অহংকার, ঐশ্বর্য, ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিকতা প্রভৃতি থেকে যথা সম্ভব দূরে থেকে ঈশ্বর ভজনাকেই মানুষের চরম লক্ষ বলে মনে করতেন।

সাধক রামদাস (খ্রীঃ ১৬০৮-১৬৮১) এর জীবন ছিল মহারাষ্ট্রের অন্যান্য ভক্ত সাধকদের জীবন থেকে ভিন্ন। অতি অল্প বয়সেই নারায়ণ (রামদাসের পূর্বাশ্রম নাম) গৃহত্যাগী হন এবং সহায়সম্বলহীন ভবঘুরে জীবনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন সাধুসন্তদের সঙ্গে কাটিয়ে শেষে কৃষ্ণা নদী তীরে নিজের আশ্রম গড়ে তোলেন। রামদাসের উপাস্য দেবতা হলেন রামচন্দ্র। তিনি ভক্তি সাধনায় কয়েকটি স্তরের কথা বলেন। যেমন, ভক্তি সাধনার প্রথম স্তরটি হ'ল সাধন অর্থাৎ ভক্ত তার মনকে সংযত রাখবে ও শান্তভাবসম্পন্ন হবে। দ্বিতীয় স্তর হ'ল অনুতাপ ও উপরতি। ঈশ্বরকে ভুলে জাগতিক ব্যাপারে যুক্ত থাকার জন্য হৃদয়ে অনুতাপ এবং ক্রমশ জাগতিক ব্যাপার, আকাঙ্খা, লোভ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া অর্থাৎ উপরতি ভক্তের অবশ্য কার্য। তৃতীয় স্তর হ'ল একান্ত বা নির্জনতা বা একাগ্রতা। চতুর্থ স্তর হ'ল বিমল জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। পঞ্চম স্তর হ'ল ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণের মধ্যে সেই মানুষ জীবনের মুক্তি পেতে পারে। অবশ্য রামদাস ঈশ্বর লাভে ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। রামদাসের মতে, যে কোন উপায়েই ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাওয়া যেতে পারে। একারণে তিনি অন্যতম শিষ্য শিবাজীর কর্মযোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাঁর ভক্তিগীতিগুলির মধ্যে শুধুমাত্র ঈশ্বরের সান্নিধ্যের কথাই বলা হয়নি; সমাজসংস্কারের কথাও বলা হয়েছে। সাধক রামদাস একদিক থেকে অন্য ভক্তদের থেকে কছুটা ভিন্ন; কারণ, তাঁর ভক্তি বন্দনার একমাত্র বিষয় আত্মার মুক্তিই নয়, সমাজের ও সংস্কার। রামদাসের এই সমাজসংস্কার ভাবধারা তাঁর অন্যতম শিষ্য শিবাজীকে সমাজসংস্কারে উদ্বুদ্ধ করে। জর্ডেন্স (Jordens) এর মতে, মহারাষ্ট্রের এই ভক্তিসাধকগণ হিন্দুত্বকে পুর্ণজাগরিত করেছিলেন। মারাঠী ভাষা ও সংস্কৃতিকে স্বতন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সামাজিক শক্তিগুলির একীকরণে জোর দিয়েছিলেন। মারাঠায় হিন্দু রাষ্ট্র গড়ে তোলায় এই বিষয়গুলি এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উপাদান হিসাবে কাজ করেছে এবং পরের দিকে মহারাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদী সংস্কার আন্দোলনের পথ প্রস্তুত করেছে।

৩৬.৬ ভক্তি আন্দোলন — উত্তর ভারত

দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে উত্তর ভারতের ভক্তি আন্দোলনের যোগসূত্র স্থাপন করেন রামানন্দ (খ্রীঃ ১২৯৯ মতান্তরে ১৩০০ - ১৪১১(?))। তিনি বারানসীতে এক ব্রাক্ষণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে রামানুজের বৈষ্ণবধারায় দীক্ষিত হন। কিন্তু রামানন্দ দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণবসাধকদের থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। তিনি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা ও জাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে তিনি হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থসমূহ বিশেষত বেদান্ত থেকে অথবা ইসলামের সেসময়কার সুফি সাধকদের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন— সে সম্পর্কে তথ্য প্রমানের অভাবে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা মুস্কিল। তবে, সুরজিৎ দাশগুপ্তের মতে, ধর্মপিপাসু রামানন্দ যখন সত্যের সন্ধানে ভারতবর্ষ পরিক্রমণ করেন তখন মুসলিম সাধকদের উদার বক্তব্য ও ব্যাপক প্রভাবের পরিচয় তিনি নিঃসন্দেহে যথেষ্ট পরিমানেই পেয়েছিলেন। সে

সময়কার জাত বৈষম্যে জর্জরিত হিন্দু সমাজে রামানন্দের এই সমাজসমতার ধারণা নিঃসন্দেহে অভিনব ও বৈপ্লবিক। এর ফলে রামানন্দের শিষ্য বাছাইকরণের ক্ষেত্রে জাত বা ধর্মের বিষয়টি প্রধান হয়ে ওঠেনি। জাত, বৃত্তি, সংসার, নারী কোন কিছুকেই রামানন্দ সাধনার পথে অন্তরায় বলে মনে করেননি। একারণে তিনি সংসার ত্যাগের মাধ্যমে সাধনারও ছিলেন বিরোধী, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নারী। অনেক মুসলমান ও রামানন্দের ভাবধারয় আকৃষ্ট হন। তিনি কোনরূপ প্রতিষ্ঠানিকতা বা সম্প্রদায় গঠনেরও ছিলেন বিরোধী। তাঁর ভজন গীতিগুলি একদিকে যেমন উত্তর ভারতে ভক্তিধারার প্লাবন এনেছিল, অপরদিকে সঙ্গীতও সাহিত্য ভাবনাকেও সমৃদ্ধ করেছিল।

রামানন্দের ভাবশিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলেন কবীর (খ্রীঃ ১৪২৪-১৫১৮)। কবীর হিন্দু না মুসলমান — এই প্রশ্ন তাঁর জন্ম কে ঘিরে যেমন রয়েছে, মৃত্যুর পর তাঁর দেহকে ঘিরেও একই প্রশ্ন। কিংবদন্তী অনুযায়ী তিনি এক ব্রাহ্মণ বিধবার সন্তান; কিন্তু পালিত হন নীরু নামে এক মুসলমান তাঁতির ঘরে। কবীর ও রামানন্দের মতো সংসার ত্যাগের মাধ্যমে নির্জন সাধনার বিরোধী। তিনি এই সংসার জীবনকে ঈশ্বরেরই লীলাস্বরূপ এবং একারণে সংসার থেকে পালিয়ে ঈশ্বর ভজনাকে ঈশ্বরের লীলা বিরোধী বলে মনে করতেন। তাছাড়া তিনি প্রতিটি মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর এর বাস করেন বলে বিশ্বাস করতেন। আচার অনুষ্ঠান সম্পাদন বা শাস্ত্রমতে ঈশ্বর অন্বেষণের পরিবর্তে তিনি সহজ সাধনার মাধ্যমে নিজের মধ্যে যে দেবতার বাস তাকে বুঝে নিতে বলেন। যেহেতু ঈশ্বর প্রতিটি মানুষের হৃদয়েই বাস করেন সেহেতু প্রতিটি মানুষই সমান এবং একারণে তিনি জাত ব্যবস্থার ও বিরোধী। তাঁর চিন্তাভাবনার একদিকে যেমন রামানন্দ আশ্রিত ভক্তিসাধনা অপরদিকে সুফি সাধকদের মরমিয়া সাধনার এক অদ্ভুত যোগ লক্ষ করা যায়। তিনি ইসলামের গূঢ় জ্ঞান লাভ করার জন্য মক্কা, বাগদাদ, সমরখন্ড, বোখরা পর্যন্ত গিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। সুরজিৎ দাশগুপ্তের মতে, কবীরই প্রথম খুব সচেতনভাবে হিন্দু ও মুসলিম সমন্বয়ের বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন এবং আজীবন এই সমন্বয়ের জন্য সাধনা করেছিলেন। তিনি বলতেন।

হিন্দুকী হিন্দ্‌বাই দেখি তুর্কনকী তুর্কাঈ
আর ইন দুহূ রাহ না পাঈ।
দাস কবীর কাঢ়ী ভোলী দোউরাহ বিচ রাহ।।

(হিন্দুর হিন্দুয়ানী আর মুসলমানের মুসলমানী তো দেখেছি — এরা কেউ রাস্তার নিশানা পেল না; দাস কবীর এই দুই রাস্তাকে যুক্ত করে মধ্যের রাস্তা মুক্ত করতে চায়। সুরজিৎ দাশগুপ্ত (বঙ্গাব্দ ১৩৮৩, পৃঃ ৬৪)

কবীরের সুযোগ্য শিষ্য হলেন নানক (খ্রীঃ ১৪৬৯-১৫৩৮) যিনি কবীরের মতোই হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় আনুষ্ঠিকতার হিন্দুধর্মের আচার-সর্বস্বতা, মূর্ত্তিপূজা ও জাতব্যবস্থার ছিলেন বিরোধী। তাঁর মতে, অন্তরকে শুদ্ধ রাখা ভগবানের প্রতি গভীর ভালবাসা ও সকল মানুষের প্রতি সমদৃষ্টিই

ধর্মপালনের তথা ঈশ্বর লাভের প্রকৃত উপায়। নানকও ইসলাম দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন যে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল। কিন্তু তিনি তার পূর্ববর্তী হিন্দু সাধুসন্তানদের দ্বারা যে বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন তা অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি সম্ভবত ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তার পূর্ববর্তী সাধুসন্তানদের মাধ্যমে। অপর মত অনুযায়ী, নানক ইসলামে সাধনা করেন সৈয়দ হুসেনের কাছে। তিনি গায়ক সঙ্গী মর্দানাকে নিয়ে দক্ষিণে সিংহল থেকে উত্তর পশ্চিমে মক্কা ও মদীনা এবং পূর্বে আসাম পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। নানকের কাছে ঈশ্বর এক ও অভিন্ন; বস্তুজগৎ ঈশ্বরেরই লীলাস্বরূপ। ঈশ্বর আরাধনার জন্য নানক যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছিলেন তা 'আদিগ্রন্থসাহেব' নামক গ্রন্থে গ্রহিত হয়েছে। তাঁর ধর্মদর্শনই পরবর্তীকালে শিখ ধর্মের জন্ম দিয়েছে।

সুরদাস (খ্রীঃ ১৪৮৩ মতান্তরে ১৪৭৩-১৫৬৩) হলেন উত্তর ভারতের আর এক জনপ্রিয় ভক্তি সাধক যিনি আগ্রা মথুরায় অন্ধচারণকবি নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন বল্লভাচার্যের প্রধান আটজন ভক্তের মধ্যে একজন। শোনা যায়, বল্লভাচার্য সুরদাসের গানশুনে এতই মুগ্ধ হয়ে যান যে তিনি সুরদাসকে শিষ্যত্বে বরণ করেন এবং ভক্তিগীতি রচনায় উৎসাহিত করেন। লোকশ্রুতি অনুযায়ী তিনি প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার গান রচনা করেন এবং এর মধ্যে মাত্র ১০ হাজার গান নিয়ে প্রকাশিত হয় 'সুরসাগর' নামে এক সংকলন গ্রন্থ। সুরদাসের ভক্তিগীতিকে কৃষ্ণের শৈশব ও কৈশোরের দিকগুলিই মূলত প্রধান বিষয়। কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি তুলসীদাসের পরেই। শোনাযায়, আকবরের সভাগায়ক তানসেনও সুরদাসের গান গাইতেন এবং সুরদাসের গানে বিমুগ্ধ আকবর সুরদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সুরদাসের জীবন ছিল খুব সহজ সরল। তাঁর মতে, জীবনে কোন ব্যাপারে অনুতাপের আগুনে মানুষ যখন দগ্ধ হতে থাকে তখনই তার মন ঈশ্বরমুখী হয়। যে মানুষ যৌবনের দিনগুলি বৃথা কাজে ব্যয় করে জীবনের শেষদিনগুলিতে ঈশ্বরের কথা ভাবে, সে মানুষ সারা বছর ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষার আগে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পড়ুয়ার মতোই মুর্খ, তাছাড়া মানুষের জীবনে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুগুলি অত্যন্ত সক্রিয়। একমাত্র ঈশ্বরের চরণে ভক্তি নিবেদনের মাধ্যমেই মানুষ এই দুষ্ট প্রবনতা থেকে মুক্তি পেতে পারে। তিনি উপমা দিয়ে বলেন, গভীর সমুদ্রে ভাসমান জাহাজের মাস্তুলে বসা পাখি বার বার চেষ্টা করে তীরে আসতে; কিন্তু প্রতিবারেই ক্লান্ত হয়ে ফিরে যায় মাস্তুলে। সে রকম মানুষ ও এই জগৎ সমুদ্রে বস্তুগত চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সুখ পেতে চায়। কিন্তু প্রকৃত সুখ তখনই পায় যখন মাস্তুলে আশ্রয় নেওয়া ক্লান্ত পাখির মতো ঈশ্বরের কাছে আশ্রয় নেয়।

উত্তর ভারতে রামানন্দের আর এক সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হলেন তুলসীদাস (খ্রীঃ ১৫৩২-১৬২৩)। তাঁর রামচরিতমানস এতই জনপ্রিয় ছিল যে তাঁকে বাল্মীকির অবতার বলে মনে করা হ'ত। তুলসীদাসের জীবনী সম্পর্কে তথ্যের অভাব রয়েছে যথেষ্ট। জর্ডেন্স (Jordens) এর মতে, তুলসীদাস সম্ভবত সংস্কৃত নিয়ে পড়াশুনা করেন এবং পরে বারানসীতেই বসবাস করেন। তুলসীদাসের সঙ্গে অন্যান্য ভক্তি সাধকদের

পার্থক্য হ'ল রামানন্দ কবীর বা নানকের মতো তুলসীদাস শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ ও জাতব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন না। বরঞ্চ, তিনি হিন্দু শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য ও জাতব্যবস্থার মধ্যে থেকেই সংস্কার করতে চেয়েছেন। যেকোনও জাতভুক্ত ব্যক্তিই ভক্তিসাধনার যোগ্য। অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তিই তার নিজস্ব জাতগত অবস্থান থেকে ভক্তি সাধনা করতে পারে। এর জন্য জাতব্যবস্থাকে ভেঙ্গেফেলার বা এর বিরুদ্ধে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। তুলসীদাসের ভক্তি সাধনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল তুলসীদাস ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ককে প্রভুর সঙ্গে ভৃত্যের সম্পর্কের অনুরূপ বলে মনে করেন। অন্যান্য বৈষ্ণবীয় ভাবনায় সখা বা বন্ধুভাবে বা রাধাভাবে কৃষ্ণকে লাভ করার পরিবর্তে তুলসীদাস কৃষ্ণকে প্রভু হিসেবে দেখতে ইচ্ছুক। তাই তাঁর রামায়ণে সকলেই রামের প্রতি অনুরক্ত — রামের সেবক। এমনকি, কৈকেয়ী বা রাবণ ও রামের ভক্ত; কাবণ, রামছাড়া মুক্তির কোন উপায় নেই। এই ভক্তি প্রত্যক্ষ সহজভক্তি যা সকলের জন্যই উন্মুক্ত। জর্ডেন্স (Jordens) উত্তরভারতে হিন্দুধর্মে তুলসীদাসের এই অপরিমিত প্রভাবের তিনটি ধরনের উল্লেখ করেন। প্রথমত, তুলসীদাস রামভজনাকে জনপ্রিয় করে তোলেন (প্রসঙ্গত, আততায়ীর গুলিতে বিদ্ধ গান্ধীজীও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন 'হে রাম' উচ্চারণ করে)। দ্বিতীয়ত, তুলসীদাস ভক্তি সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিকতা, দয়া, প্রভৃতি মানবিক গুণগুলির উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেন। তৃতীয়ত, যখন উত্তরভারতে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের অন্তর্ভূক্ত বহু সম্প্রদায় হিন্দু সনাতন ধর্মকে আঘাত করতে উদ্যত, তখন তুলসীদাস সনাতন হিন্দুধর্মের কাঠামোকে শক্তিশালী করতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

উত্তর ভারতে ভক্তি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, উত্তরভারতে ভক্তি সাধকদের মধ্যে নির্গুণ ও সগুণ উপাসনা — উভয়ই লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণভারত বা মহারাষ্ট্রের তুলনায় উত্তর ভারতে ভক্তিসাধনায় সুফিবাদের প্রভাব স্পষ্ট। তৃতীয়ত, অধিকাংশ ভক্তিসাধকই (তুলসীদাস বাদে) জাত ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার বিধি নিষেধকে মানেননি। শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে অধিকাংশ ভক্তিসাধকই ছিলেন প্রতিবাদী। শুধু তত্ত্বের আকারে নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও সাধকগণ তা অনুসরণ করেছেন। চতুর্থত, সাধারণ মানুষের কাছে এই ভক্তিসাধকগণ ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। পঞ্চমত, এই সমস্ত সাধকগণ যদিও ছিলেন প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরোধী কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুরু-শিষ্য পরম্পরায় সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। ষষ্ঠত, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ এই সমস্ত মরমীয় সাধকদের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনে এই সাধকগণের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সপ্তমত, হিন্দু ও মুসলমান উভয়, সম্প্রদায়েরই শাস্ত্রীয় ব্যক্তিদের কাছে ভক্তি সাধকগণ ছিলেন ঈর্ষার ও ক্রোধের পাত্র। এই সমস্ত সাধকগণও ছিলেন জাত বিন্যাস্ত ব্রাহ্মন্যকেন্দ্রিক হিন্দু ধর্মের কাছে অপাঙক্তেয়। যার ফলে অধিকাংশ সম্প্রদায়ই পরবর্তীকালে জাত বিশ্যস্ত সমাজেরই অন্য এক জাতে পরিণত হয়েছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম নানক যাঁর আদর্শ এক ভিন্ন ধর্মের তথা শিখ ধর্মের জন্ম দেয়। অষ্টমত, অধিকাংশ ভক্তি সাধকগণ ভক্তিগীতির মাধ্যমে তাঁদের দর্শনকে তুলে ধরেন এবং প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে সংস্কৃতের পরিবর্তে স্থানীয় ভাষাকে গ্রহণ করেন।

নানক তো সংস্কৃতকে বদ্ধ জল এর সঙ্গে তুলনা করেন। এই ভক্তি আন্দোলনের ফলে স্থানীয় ভাষাচর্চাও এক নতুন রূপ নেয়।

৩৬.৭ ভক্তিআন্দোলন — পূর্বভারত

পূর্বভারতে ভক্তি আন্দোলনের নায়ক হলেন শঙ্করদেব (আসাম) এবং শ্রীচৈতন্যদেব (বাংলা)। উত্তর ভারতের মতো আসামে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার প্রসার তেমন ঘটেনি। এখানে আর্যপূর্ব মঙ্গোল বা কিরাত জাতীয় মানুষই ছিল প্রধান। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে পূজার্চনায় যাদুবিদ্যা, তন্ত্র সাধনা, ডাকিনীতন্ত্র বিভিন্ন ধরনের আদিম সংস্কার ইত্যাদিই ছিল প্রধান। এরকম এক সমাজব্যবস্থার বৌদ্ধিক ভাবনায় এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে এলেন শঙ্করদেব (? — ১৫৭৯)। তিনি যাদুবিদ্যা, তন্ত্রসাধনা প্রভৃতির পরিবর্তে বিষ্ণু/কৃষ্ণ আরাধনা প্রবর্তন করেন। জীববলি বা বিভিন্ন ধরনের আধিভৌতিক ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা বা প্রেমকেই তিনি প্রধান বলে গণ্য করেন। সুরজিৎ দাশগুপ্তের (বঙ্গাব্দ ১৩৮৩) ভাষায় শঙ্করদেবের বক্তব্য হোল, "প্রার্থনা, প্রশস্তি ও যৎসামান্ন পুষ্পার্ঘতেই ভগবান তুষ্ট হন—অবশ্য যদি তা প্রাণ থেকে স্বতোৎসারিত হয়"। শঙ্করদেবের এই বক্তব্য সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলে এবং অনেক গ্রামেই নামগান করার জন্য নামঘর ও তৈরী হয়। এই নামঘর প্রাঙ্গনে বিভিন্নজাতের মানুষ সমবেত হতেন এবং ধর্মালোচনা ও নামকীর্তন করতেন।

বাংলা দেশে ভক্তি আন্দোলনে যিনি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি হলেন চৈতন্যদেব (খ্রীঃ ১৪৮৬-১৫৩৩, গৃহনাম-বিশ্বম্ভর, ডাকনাম নিমাই, আশ্রমনাম—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব)। ডঃ এম. এ. রহিম (১৯৯৬) সুরজিৎ দাশগুপ্ত প্রমুখ পন্ডিতগণ মনে করেন, চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলন ছিল প্রধানত একটি প্রতিরক্ষা মূলক আন্দোলন। মুসলমানদের ধর্ম ও জীবনের আদর্শে হিন্দুসমাজের সংস্কার করে হিন্দু সমাজে ইসলাম প্রসারের পথ বন্ধ করতে চৈতন্যদেব ভক্তি আন্দোলনের ডাক দেন। এই সমস্ত পন্ডিতগণের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হ'ল চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনে সুফিবাদের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। চৈতন্যদেবের ধর্মসভায় নামসংকীর্তন করা, মোহাবিষ্ট অবস্থায় নৃত্য করা, সুফিদের যথাক্রমে জিকর, দশা, হাল প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলির দ্যোতক।

এর ঠিক বিপরীত বক্তব্য প্রকাশ করেন ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার রমাকান্ত চক্রবর্তী প্রমুখ পন্ডিতগণ। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনের উৎস হিন্দু ঐতিহ্য থেকেই। বাইশ বছর বয়সে বিশ্বম্ভর যখন গয়ায় যান সেসময় ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে এবং ঈশ্বরপুরীর কাছে তিনি কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হ'ল। এই ঘটনাই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তিনি অবিরাম কৃষ্ণনাম জপ করেন, কখনও কাঁদেন, কখনও হাসেন। তাছাড়া, চৈতন্যদেবের জীবনে জয়দেব ও চন্ডীদাসের প্রভাবের কথাও রমেশচন্দ্র মজুমদার উল্লেখ করেন। রমাকান্ত চক্রবর্ত্তীর মতে, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর সহচরগণ ভক্তির সঙ্গে ভাগবতপুরানে বর্ণিত কৃষ্ণ লীলা কাহিনীর মিশ্রণ ঘটান। তিনি অবশ্য একথাও স্বীকার করেন যে বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবধর্ম, বৌদ্ধ সহজ ভাবধারা হিন্দুতন্ত্র, এবং কখনও কখনও সুফিবাদ প্রভাবিত।

হিতেশরঞ্জন সান্যালের মতে, ভক্তি ধারণাটি উপনিষদের মধ্যে নিহিত থাকলেও ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত সময়জুড়ে গোটা ভারতে মুক্তি ও সহকারিতার ধারণা নিয়ে ভক্তি আন্দোলন এক ব্যাপক আকার নেয়। বৈষ্ণবসম্পর্কিত ভক্তি ভাবনা পৌরানিক ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে রক্ষণশীলতার এক সহনীয় বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে ওঠে এবং ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার বাইরে যে এক গূঢ় রহস্যবাদী সাধনার ঐতিহ্য এতদিন ধরে বজায় ছিল তা এই ভক্তি আন্দোলন আত্মস্থ করে নেয়। ভারতের প্রায় সব জায়গাতেই ভক্তি আন্দোলন হিন্দু সমাজের শাস্ত্রীয় ধারার এক সমান্তরাল ধারা হিসেবে প্রচলিত হতে থাকে। এই ভক্তি আন্দোলনের এক সর্বভারতীয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকলেও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত ভক্তি আন্দোলনগুলিতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলিও ছিল প্রকট। বাংলায় এই আন্দোলন গড়ে ওঠে বাংলার স্বকীয় ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করেই। হিতেশরঞ্জন সান্যালের মতে, বাংলায় একদিকে সর্বভারতীয় শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য বজায় ছিল। অপরদিকে ত্রয়োদশ শতকের প্রথম থেকেই মুসলমানদের আগমনে পশ্চিম এশিয়ার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিও বাংলার সম্প্রসারিত হতে থাকে। কিন্তু এই সমস্ত প্রভাবসত্ত্বেও বাংলার নিজস্ব উপাদানগুলি বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয় এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বহিরাগত প্রভাবের পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাতে বাংলার এই নিজস্ব উপাদানগুলিই নির্ধারকের ভূমিকা নেয়।

বাংলায় এই ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক স্বতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে চৈতন্যের ভক্তি আন্দোলন ষোড়শ শতকের প্রথম দশকগুলিতে বাংলার সংস্কৃতির উপর এক গভীর ছাপ ফেলে। চৈতন্যদেব অত্যন্ত সহজ ও সরাসরিভাবে ভক্তি বিশ্বাসের কথা বলেন। কৃষ্ণের প্রতি গভীর আকুতিই কৃষ্ণের প্রতি এক প্রেমভক্তির জন্ম দেয়। ভক্ত হিসেবে তিনি রাধাভাবে কৃষ্ণকে পেতে ইচ্ছুক। জাত, বর্ণ, ধর্ম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই কৃষ্ণের ভজনা করতে পারে। এর জন্য কোন আনুষ্ঠানিকতা বা শাস্ত্রীয় নির্দেশের প্রয়োজন নেই। সহজ, অপ্রাতিষ্ঠানিক ও অনুষ্ঠানবিহীন ভাবে শুধুমাত্র কৃষ্ণনামসংকীর্তনের মধ্যদিয়েই কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। এই নামসংকীর্তনে অংশগ্রহণের ফলে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এক ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং যা পরবর্তীপর্যায়ে সম্প্রদায় সৃষ্টির সহায়ক হয়। এভাবে বাংলায় ভক্তি আন্দোলনে যে মুক্তি ও সহকারিতার ধারণা প্রকাশ পায় তা আসলে আঞ্চলিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠার ফলে আত্মপ্রকাশের উন্মুখ সে সময়কার সাধারণ মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদাকেই প্রকাশ করে।

হিতেশরঞ্জন সান্যাল চৈতন্যদেবের অধ্যাত্ম জীবনকে দু'টি পর্যায়ে ভাগ করেন। প্রথমপর্যায়ে তিনি নবদ্বীপের এক গৃহী, সুপন্ডিত; একটি টোলও পরিচালনা করেন। একসময়ে নবদ্বীপের মানুষের কাছেও তিনি খুবই পরিচিত। কারণ, বৈষ্ণব ভাবধারাকে তিনি সকলের জন্যই প্রচার করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি পুরীতে বসবাস করেন। এই পর্বে তিনি রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণের মিলনাকাঙ্খী। তিনি প্রথমদিকে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত এবং পরে উত্তর ভারতে পরিভ্রমণ করেন। যদিও তিনি কোন সম্প্রদায় গড়ে তোলেননি তথাপি তিনি নিত্যানন্দের উপর ভার দেন বাংলায় ভক্তিপ্রচারে। রূপ ও সনাতনের উপর ভার দেন বৃন্দাবনে বসবাসের মাধ্যমে বৈষ্ণব ঐতিহ্যকে সংহতিকরণে। বৃন্দাবনের ছয় ভক্তের কণিষ্ঠতম শ্রীজীব গোস্বামী তিনজন বাঙালী ভক্তকে বাংলাদেশে পাঠান বৃন্দাবনের ভজনধারার (ব্রজ মন্ডল) এর সঙ্গে

বাংলার ভজনধারার (গৌর মন্ডল) সমন্বয় ঘটানোর জন্য। এই তিনজনের মধ্যে নরোত্তম দাস রাজশাহীজেলার খেজুরীতে আশ্রম গড়ে তোলেন।

বাংলার এই ভক্তি আন্দোলনে সমাজের নিচুতলার মানুষের মধ্যে যে ব্যাপক সাড়া জাগে তার কারণ হ'ল সামাজিক ও অর্থনৈতিক। সে সময়ে নবদ্বীপ শহরে কারিগর ও কারবারীদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে এই সমস্ত আত্মপ্রত্যয়ে বলিষ্ঠ শ্রেণীগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এবং এদের বড় অংশই পরবর্তিকালে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনে যোগ দেন। তাছাড়া, শ্রীচৈতন্যদেব যে সময়ে ভক্তি আন্দোলন গড়ে তোলেন সে সময়েবাংলার বিভিন্ন ধরনের গূঢ় ও রহস্যবাদী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। তন্ত্রসাধক, বৌদ্ধ, শক্তিসাধক, কাপালিক, অবধূত, নাথযোগী তন্ত্রভাবনায় প্রভাবিত বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় যা সহজিয়া সম্প্রদায় নামে পরিচিত — প্রভৃতি সম্প্রদায় ভুক্ত লোকের সংখ্যা ছিল প্রচুর। এই সব সম্প্রদায়ের উপাসনার পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট ভিন্নতা থাকলেও উপাসনার মধ্যে দেহজ ব্যাপার গুরুত্ব পেত অনেক বেশী। এমনকি পুরুষ ও নারীর মিলনের মধ্যে দিয়ে চরমসত্বাকে উপলব্ধি করার ধারণাও ছিল প্রবল। এই সমস্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণ্য কেন্দ্রিক শাস্ত্রীয় রীতিনীতির অনুষ্ঠান প্রভৃতি থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকতেন। বলা বাহুল্য, সমাজের উপর তলার তথা উচ্চবর্ণের মানুষ এই সমস্ত সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ স্বাভাবিক ভাবে মেনে নেয়নি। ফলে সমাজে এই সমস্ত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের স্থান ছিল নিচুস্তরে এবং এদের সাধনাও ছিল অনেকক্ষেত্রে গোপন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিআন্দোলন এই সম্প্রদায়গুলির কাছে এক মুক্তির স্বাদ এনে দেয়। নারী-পুরুষ, জাত-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি উদাত্ত সংকীর্তনের মধ্যে দিয়ে সামাজিক সমতা, ভ্রাতৃত্ব ও সহকারিতা, রাধাকৃষ্ণ প্রেমের ধারণায় রাধাভাবে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন (যা উপরোক্ত সম্প্রায়গুলির কাছে নারী-পুরুষের মিলনের মধ্যে দিয়ে চরমসত্তার মিলন) প্রভৃতি বিষয়গুলি উপরোক্ত গূঢ় রহস্যবাদী সম্প্রদায়গুলির কাছে নিজেদের প্রকাশ্যে প্রতিষ্ঠিত হবার এক সুযোগ এনে দেয়। তারা দলে দলে শ্রীচৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়ে আন্দোলনের ধারাকে স্ফীত করে তোলে। ডোম, চন্ডাল, মুসলমান, নারী যারা এতদিন ছিল সমাজের প্রান্তিক মানুষ তারাও এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এক আত্মপ্রত্যযের সুযোগ খুঁজে পায়। যদিও মুসলমান যবন হরিদাসের এক পংক্তিতে ভোজনের ব্যাপারে দ্বিধাকে তিনি মেনে নেন। শ্রীচৈতন্যর পার্ষদ নরহরি সরকার এবং বংশীবাদন পুরীর শ্রীচৈতন্য সঙ্গী স্বরূপদামোদর রায় রামানন্দ ছিলেন সহজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত।

এভাবে বাংলার ভক্তি আন্দোলন এক উদারনৈতিক ভাবধারায় ব্যক্তির মুক্তি ও সহকারিতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলিকে ক্রমশ আত্মস্থ করে নেয় এবং শাস্ত্রীয় ধর্মীয় জীবনের সমান্তরাল ভাবে এই ভক্তিআন্দোলনের ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলন আঞ্চলিক বাংলার সংস্কৃতির বিকাশের আত্মপ্রত্যয়কে প্রকাশ করে। হিতেশরঞ্জন সান্যালের মতে, চৈতন্য হয়ে ওঠেন বাঙালীর আত্মপ্রত্যয়ের প্রতীক। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে চৈতন্য অনুগামীরা চৈতন্যদেবকেই কৃষ্ণ / বিষ্ণুর অংশ জ্ঞান করে চৈতন্যদেবকে দেবতার আসনে বসান। বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব তীব্র হয়ে ওঠে, এবং জাত ভিত্তিক ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের চাপের কাছে বৈষ্ণবগণ এক ভিন্ন জাতে পরিণত হন।

৩৬.৮ ভক্তিআন্দোলন ও নারী

ভক্তি আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, মধ্যযুগে ভারতে প্রায় সর্বত্রই ভক্তি আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। জাত, ধর্ম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই বিশেষ করে সমাজের প্রান্তিক মানুষেরা এই আন্দোলনের মাধ্যমে এক আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়। এক উদারনৈতিক আবহাওয়ায় মক্তি, সহকারিতা, সমতা প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই আন্দোলনে নারীমুক্তির বিষয়টি বা এই আন্দোলনে নারীর অংশ গ্রহণের বিষয়টি খুব একটা আলোচিত হয়নি। আমরা এই অংশে দেখব ভক্তি সাধকগণ নারীমুক্তির বিষয়টি কিভাবে দেখেছেন। পরে আলোচিত হবে ভক্তি আন্দোলনে নারীদের অংশ গ্রহণের বিষয়টি।

৩৬.৮.১ ভক্তিসাধকগণের দৃষ্টিতে নারী

ভক্তিসাধকগণের অধিকাংশই নারীকে দেখেছেন কামিনী হিসেবে-কাম চরিতার্থ করার এক সামগ্রী হিসেবে। এবং একারণে নারীদের কাছ থেকে (অনেক ক্ষেত্রে সংসার বর্জনের মধ্য দিয়ে) যথা সম্ভব দূরে থাকতে চেয়েছেন। ব্যতিক্রম যে ছিল না তা নয়। যেমন অস্পৃশ্য রূইদাস ছিলেন মীরাবাঈ এর গুরু। তুলসীদাসের সঙ্গে ও মীরাবাঈ এর ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। নিম্নজাতের তুকারাম ছিলেন সাধিকা বহিনবাঈ এর গুরু। আবার অনেক ভক্তি সাধকই সংসার জীবন যাপনের মধ্যদিয়েই ভক্তি সাধনা করেছেন। কিন্তু নারীদের সাধনার পথে অন্তরায় হিসেবেই দেখা হত। যেমন কবীর মনে করতেন কামিনী এবং কাঞ্চন উভয়েই মানুষকে সাধনার পথ থেকে ভ্রষ্ট করে।

এমনকি নারীকে কাল নাগিনীর সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। ভক্ত সাধক দাদুও পরামর্শ দিয়েছেন কনক ও কামিনী থেকে দূরে থাকতে। কারণ আগুনে যেমন পোকামাকড় পুড়ে ছাই হয় নারীও সেরকম জগৎকে দগ্ধ করে। তামিল সংগীতেই কামিনী ও কাঞ্চনকে মানুষের পতনের কারণ বলা হয়েছে। সপ্তম শতকের শৈব সাধক সুন্দরী নারীর চোখকে মায়াবী হরিণের চোখের সঙ্গে তুলনা করেছেন। দশমশতকে সাধক মনিক্কবছকর নারীর সম্মোহনী শক্তির তথা কালো চোখ, লাল ঠোঁট এবং মুক্তো ঝড়ানো হাসিতে ভরা নারীর আকর্ষণ থেকে দূরে থাকতেই চেয়েছেন। শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে মীরাবাঈ যখন বৃন্দাবনে সাক্ষাৎ করতে আসেন তখন শ্রীজীব গোস্বামী সাক্ষাতে অসম্মত হ'ন; কারণ মীরাবাঈ সাধিকা হলেও নারী। শ্রী চৈতন্যদেব সাধনার জন্য সংসার ত্যাগ করেন। এক বৃদ্ধা বৈষ্ণবীর কাছ থেকে চাল সংগ্রহের জন্য নারী সংসর্গের অপরাধে শিষ্য ছোট হরিদাসকে তিনি তাড়িয়ে দেন।

অবশ্য কোনও কোনও ভক্তি সাধক নারীকে কামিনী হিসেবে না দেখে নারীর প্রশংসা করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও নারীর অন্যতম গুণ হিসেবে দৈহিক ও মানসিক বিশুদ্ধতার উপর জোর দিয়েছেন। যেমন দক্ষিণ ভারতের ভক্তিসাধক তিরুবল্লুভর বা উত্তরভারতের কবীর নারীর দৈহিক ও চারিত্রিক বিশুদ্ধতা বজায় রাখার উপর জোর দিয়েছেন। নানক নারীকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কারণ, নারী মাতা হিসেবে সন্তানের জন্ম দেয়, স্ত্রী হিসেবে স্বামীকে সঙ্গ দেয় এবং এভাবে মানুষের অস্তিত্বকেই টিকিয়ে রাখে। অর্থাৎ সমাজে নারীর

মূল্য শুধুমাত্র মা, স্ত্রী, কন্যা হিসেবে ভূমিকাটুকু পালন করে যাওয়ার জন্য। কিন্তু কোনও নারী যদি সেই ভূমিকাটুকু পালনে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হয়, অর্থাৎ কুমারী জীবন কাটাতে চায় এককথায় বিবাহ বা মাতৃত্বের বন্ধন না নিয়ে যদি কোন নারী ব্যক্তিত্ববিকাশে/মুক্তিসাধনায় অগ্রসর হয় তাহলে সেই নারীর প্রতি সমাজের এমনকি ভক্তি আন্দোলনের অধিকাংশ পুরোধাদের দৃষ্টিভঙ্গি খুব একটা ইতিবাচক ছিল না।

৩৬.৮.২ নারীর গতানুগতিক ভূমিকা অনুযায়ী ভক্তি সাধিকা

বিজয়া রামস্বামী (১৯৯৭) মধ্যযুগের ভারতের ভক্তি সাধিকাদের কয়েকটি বর্গে ভাগ করেন। এক প্রান্তে রয়েছেন সেই সমস্ত ভক্তি সাধিকা যাঁরা নারীর গতানুগতিক ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়ে ভক্তি সাধনায় অংশ নিয়েছেন। অপরপ্রান্তে আর একদল সাধিকা ছিলেন যাঁরা নারীর গতানুগতিক ভূমিকার শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্ত স্বাধীন জীবনচর্চার দিকে এগিয়ে যান। যে সমস্তসাধিকা নারীর গতানুগতিক ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়ে এবং যথাযথ ভাবে পালন করে ভক্তিসাধনার দিকে এগিয়ে যান তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন বাসুকি (সাধক তিরুবল্লুভর এর স্ত্রী) নিলম্ব (বীরশৈব ভক্ত বাসব এর স্ত্রী) বিষ্ণুপ্রিয়া (শ্রীচৈতন্যের স্ত্রী) সীতাদেবী (অদ্বৈত আচার্যের স্ত্রী) জাহ্নবীদেবী (নিত্যানন্দের দ্বিতীয় স্ত্রী) হেমলতা ঠাকুরাণী (শ্রী নিবাস আচার্যের কন্যা)। বাসুকি বা বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর সমস্ত আদেশকেই দেবতার আদেশ বলে মেনে নিতেন এবং এটাকেই চরম ধর্মাচরণ বলে মনে করতেন। স্বামীর নির্দেশ মানতে গিয়ে যদি নিজের পবিত্রতাকেও জলাঞ্জলি দিতে হয় তাহলেও স্বাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে তা করা উচিত। যেমন করেছিলেন কবীরের স্ত্রী যখন কবীর তাঁকে এক বনিকের কাছে অর্পণ করেন (অন্যমতে কবীর বিয়েই করেন নি), বা নায়নার সাধক আয়ারপপ্পয়ার এর স্ত্রী, যিনি স্বামীর নির্দেশে এক অতিথির মনোরঞ্জন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব যখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন তখন তাঁর গৃহীজীবনের সমাপ্তি ঘটেছে। দ্বিতীয় স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রত্যাশা ছিল যাতে তিনি শ্রীচৈতন্যের মাকে দেখাশুনা করেন, অর্থাৎ সাংসারিক দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েই এই সমস্ত নারীগণ সাধনার পথে এগিয়ে যাবেন।

৩৬.৮.৩ নারীর গতানুগতিক ভূমিকা পালনের বিরোধী ভক্তি সাধিকা

বিপরীত দিকে লাল্লা, মীরাবাঈ, অক্কামহাদেবী ছিলেন বিদ্রোহী যাঁরা বিবাহিত জীবনের (অক্কামহাদেবী রাজা কৌশিক এর অন্তঃপুর বাসিনী ছিলেন কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিয়ে হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট তথ্য নেই) অত্যাচার ও প্রবঞ্চনায় গতানুগতির নারী জীবনের বাঁধাধরা গন্ডি থেকে বেড়িয়ে এসেছিলেন। লাল্লার বিয়ে হয়েছিল বারো বছর বয়সে এবং মীরাবাঈ বিয়ের (মেবারের রানা ভোজরাজ এর সঙ্গে) কিছু দিন পরেই বিধবা হন। রূপা ভবাণীর বিয়ে হয় যখন তাঁর বয়স দশবছরও হয়নি এবং যাঁকে বিয়ের পর যৌতুক ও অন্যান্য কারণে প্রচুর নির্যাতন সহ্য করতে হয়। এই নির্যাতনের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে তিনি গৃহত্যাগী হন এবং এক সুফি সাধক শাহি কালন্দর এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মীরাবাঈ এর একটি ভজনে দেখা যায় —

পগ ঘুংঘরু মীরা নাচী রে। পগ ঘুংঘরু।।

লোগ কহে মীরা হোগয়ে বাওরী। সাস কহে কুল নাসী রে।।

জহর কা পেয়ালা রানাজী নে ভেজা। পীবত মীরা হাঁসী রে।।

(মীরা ঘুঁঘুর পড়ে নৃত্য করে, লোকে ভাবে মীরা পাগল হয়েছে। শাশুড়ী বলে পরিবারের নাম ডুবিয়েছে। রাণাজী বিষপাত্র পাঠায়-মীরা হাসিমুখে তা পান করে)।

শুধুমাত্র মীরাবাঈই নয়, লাল্লা বা অক্কা মহাদেবীকেও সবাই উন্মাদ হিসেবেই গণ্য করতেন। চক্কুবাঈকে তো উন্মাদ ভেবে বাড়িতে বন্দী করে রাখা হত যাতে করে চক্কুবাঈ সাধক কবীর বা নামদেব এর সঙ্গে যুক্ত হতে না পারেন'

অনেক সময় ভক্তিসাধনা নারীর সাংসারিক জীবনে বিড়ম্বনাও সৃষ্টি করত। সাধিকা পুনিতবতীর আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় ভীত স্বামী শেষ পর্যন্ত স্ত্রীকে ত্যাগ করেন এবং দ্বিতীয়বার বিয়ে করে প্রথমাস্ত্রীকে ঐশী ক্ষমতার অধিকারিণী বলে প্রণাম করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন; অথচ হিন্দু পারিবারিক জীবনে বিপরীত আচরণই লক্ষ করা যায়।

লাল্লা, মীরাবাঈ, অক্কা মহাদেবী প্রমুখ ভক্তি সাধিকাগণ সংসার জীবন থেকে বেড়িয়ে এসে নারীর গতানুগতিক ভূমিকা পালন থেকেই শুধুমাত্র সরে আসেননি; এই সমস্ত সাধিকাগন সামাজিক বিধিনিষেধগুলিকেও নিরর্থক বলে মনে করতেন। অক্কা মহাদেবী যেদিন রাজা কৌশিকের প্রাসাদ থেকে বেড়িয়ে এলেন সেদিন তাঁর আজানুলম্বিত চুলই ছিল একমাত্র আচ্ছাদন। ভক্তিসাধিকা লাল্লাও অঙ্গ আবরণের কোন প্রয়োজন বোধ করেন নি। এই সমস্ত সাধিকাগণের অনেকেই জাতভেদ, পৌত্তলিকতা প্রভৃতির ও ছিলেন বিরোধী। কবীরের মত লাল্লাও ছিলেন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই প্রিয়। অক্কাদেবী তো প্রতিমাকে পাথর বলে মনে করতেন। মীরাবাঈ, বহিলবাঈ শূদ্র-অশূদ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না।

তাছাড়া, উপরোক্ত সাধিকাগণের অধিকাংশই উপাস্য দেবতাকে স্বামী বা একমাত্র পুরুষ বলে মনে করতেন। সাধিকা মুক্তবাঈ, মীরাবাঈ, অক্কামহাদেবী যথাক্রমে বিষ্ণু, কৃষ্ণ ও মল্লিকার্জনকে স্বামী হিসেবে বরণ করেন। মীরাবাঈতো কৃষ্ণছাড়া সবাইকেই নারী হিসেবে ভাবতেন। এভাবে ঈশ্বর ও ভক্তের সম্পর্ককে স্বামী এবং স্ত্রী হিসেবে গণ্য করা শুধুমাত্র সাধিকাদের ক্ষেত্রেই নয়, মধ্যযুগের অনেক ভক্ত সাধকও নিজেদের নারী ভেবে ঈশ্বরের সাধনা করতেন। কবীর ও শ্রীচৈতন্য নিজেদের নারী/রাধা ভেবে কৃষ্ণ উপাসনা করেন।

বিজয়া রামস্বামীর (যার বিশ্লেষণ এই অংশটির আলোচনার মূল উৎস) মতে, মধ্যযুগের ভক্তি সাধিকাগণ বিশেষত নারীর গতানুগতিক ভূমিকা পালনে অনিচ্ছুক সাধিকাগণ শুধু মাত্র বিষয়গত দ্রব্য থেকেই মুক্ত ছিলেন না, সমাজ জীবন থেকেও ছিলেন বিচ্ছিন্ন। এভাবে সাধিকাগণ দ্বৈত বিচ্ছিন্নতার শিকার হন। একদিকে তাঁরা জগৎ ও জীবনের বস্তুগত চাহিদা থেকে যথাসম্ভব বিচ্ছিন্ন ছিলেন। অপরদিকে নারীর গতানুগতিক

জীবনযাত্রা থেকে দূরে থাকায় সমাজজীবন থেকেও বিচ্ছিন্ন ছিলেন। এই দ্বৈত একাকীত্ব সাধিকাদের ভক্তিগীতির মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই উচ্চারিত হয়েছে।

৩৬.৯ ভক্তি আন্দোলনের ফলাফল

মধ্যযুগে ভারতে বিভিন্নপ্রান্তে যে ভক্তি আন্দোলন প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তার ফলে সমাজে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ, সংস্কারাদি ধারার এক বিকল্প ধারার সৃষ্টি করে। শাস্ত্রীয় নিয়মকানুন, বিধিনিষেধ এর পরিবর্তে প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি সহজাত প্রবণতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন, ঈশ্বরের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়ার ধারণা সাময়িকভাবে হলেও ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ধারাটিকে দুর্বল করে তোলে। দক্ষিণভারতের ভক্তি আন্দোলন অবশ্য জৈন, বৌদ্ধ ও স্মার্ত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে যাজক ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করে। দ্বিতীয়ত, এই আন্দোলনের চরিত্র ছিল উদার এবং পরমতসহিষ্ণুতা ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। জাত, ধর্ম ভাষা নারী পুরুষ নির্বিশেষে মানুষ এই আন্দোলনে সামিল হন। স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এমনকি বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যেও এক সমন্বয়বাদী ভাবধারা গড়ে ওঠে। বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত বা প্রাধান্য স্থাপনের পরিবর্তে সহাবস্থান, সহকারিতা, ভ্রাতৃত্ব বোধ প্রধান বলে বিবেচিত হয়। অবশ্য, দক্ষিণ ভারতের ভক্তি আন্দোলন পুরোপুরি জাতভেদ মুক্ত ছিল বলে দাবী করা যায় না।. বাংলার ভক্তি আন্দোলন ও চৈতন্য পরবর্তী পর্যায়ে জাত ভেদকে গুরুত্ব দিতে থাকে।

তৃতীয়ত; সমাজের নিচু তলার মানুষ বৌদ্ধ, তান্ত্রিক, অবধূত, নাথ যোগী, সহজিয়া সম্প্রদায়, নারী যারা এতদিন শাস্ত্রীয় ধর্মীয় ব্যবস্থায় প্রান্তিক বলে বিবেচিত ছিল তারা এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এক মুক্তির স্বাদ পায়। আত্মপ্রত্যয়ের এক বলিষ্ঠ চেতনা লক্ষ করা যায়।

চতুর্থত, সাধারণ মানুষের কাছে বক্তব্য পৌঁছে দেবার তাগিদে ভক্তি সাধকগণ সংস্কৃতের পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষার উপর গুরুত্ব দেয়। এর ফলে ভাবের বাহন হিসেবে আঞ্চলিক ভাষাগুলি বিকশিত হবার সুযোগ পায়। কবীরের দোহাবলী হিন্দিভাষাকে, নামদেব মারাঠী ভাষাকে, নানক গুরুমুখী লিপি ও পাঞ্জাবী ভাষাকে এবং চৈতন্যদেব বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করে তোলেন।

পঞ্চমত, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পারস্পরিক লেনদেন এর মাধ্যমে শিল্প, স্থাপত্য, চিত্রাঙ্কন এক সমৃদ্ধ রূপ লাভ করে।

ষষ্ঠত, ভক্তি আন্দোলনের আর একটি অবদান হল সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ। দক্ষিণভারতে আন্দন, উত্তরভারতে মীরাবাঈ, বাংলায় শ্রী চৈতন্যের দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, অদ্বৈত আচার্যের পত্নী মীরাদেবী, নিত্যানন্দের দ্বিতীয়া স্ত্রী জাহ্নবী দেবী, শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী প্রমুখ মহিলাগণ ভক্তি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন এবং অনেককেই ভক্তি ভজনায় দীক্ষিত করেন।

ষষ্ঠত, শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ্যধারাটি ছিল শাসকগোষ্ঠীর সহায়ক ধারা। ভক্তসাধক কবীর, চৈতন্যের বিরুদ্ধে হিন্দু, মুসলমান উভয় ধর্মের শাস্ত্রীয় রক্ষণশীলগোষ্ঠী ছিলেন প্রতিবাদে সরব। সুফি সাধকগণের মধ্যে অনেকেই

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতেন। তাঁদের প্রতিবাদ ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে নয়—ইসলামের প্রাতিষ্ঠানিকতা ও খলিফাদের ব্যভিচারের বিরুদ্ধে। ইসলামের সমভ্রাতৃত্ববোধ সামাজিক সাম্য প্রভৃতি ধারণাগুলি সুফি সাধকদের ইসলাম বিরোধী করে তোলেনি; বরঞ্চ ইসলামের মধ্যেই থেকেছেন এবং ইসলামের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে রাষ্ট্রীয় শক্তির সুদৃঢ়করণের সম্ভাবনাকে স্বাগত জানিয়েছেন। রাষ্ট্র শক্তিও উভয় ধর্মেরই শাস্ত্রীয় ধারাটির সঙ্গে বোঝাপড়া করেছেন, ক্ষমতার সহায়ক শ্রেণী হিসেবে শাস্ত্রীয় গোষ্ঠীকে বেছে নিয়েছেন। বিনিময়ে উভয় ধর্মেরই শাস্ত্রীয় ধারার পোষকগণ রাষ্ট্রশক্তির কাছ থেকে পুরস্কার পেয়েছেন, রাজ দরবারে স্থান পেয়েছেন, ভূমিদান বা গ্রামদানে তুষ্ট হয়েছেন। সুফি সাধক গণও এই অনুদান থেকে বঞ্চিত হননি। কিন্তু ভক্তি সাধকগণ হিন্দু ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতার বিরোধিতা যখন করেছেন, এই ব্যবস্থার আধার হিসেবে জাত ব্যবস্থাকে ও আক্রমণ করেছেন। এর ফলে ভক্তি সাধকগণ জাতভিত্তিক ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক হিন্দুধর্মের মধ্যে আশ্রয় নেবার পরিবর্তে তার বিকল্প পথ খুঁজেছেন। রামানন্দ মীরাবাঈ, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ ভক্তি সাধকদের সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্কের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। মীরাবাঈ রাজপরিবারের সদস্য হয়েও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন তাঁর কৃষ্ণভক্তির জন্য। চৈতন্যদেবের নাম সংকীর্তন যজ্ঞের ব্যয় মেটানোর জন্য স্থানীয় বিত্তবান জমিদারদের অংশগ্রহণের দু'একটি নজীর যে নেই তা নয়; কিন্তু তা শাসকগোষ্ঠীর সহায়ক শ্রেণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিতকরণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বরঞ্চ চৈতন্যদেবের নামসংকীর্তনে রাষ্ট্রশক্তির বিরোধীতার চিত্রই ধরা পরে।

অবশ্য চৈতন্যদেবের সময়ে এবং বিশেষ করে চৈতন্যদেবের পরবর্তী পর্যায়ে বেশ কিছু জমিদারও স্থানীয় রাজা বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। বৈষ্ণব ধর্মও ইতি মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় ঐতিহ্যের অঙ্গ হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রও আভিজাত্যের প্রতি দূর্বার আকর্ষণের ফলে বৈষ্ণব প্রধানগণ বৃহত্তর জনজীবন থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হতে থাকেন এবং এর ফলে বৈষ্ণবদের মধ্যেও স্তর বিন্যাস দেখা যায়। দক্ষিণভারতে ভক্তি সাধকগণ ও রাজশক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। সাধক রামদাসের সঙ্গে শিবাজীর সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই সাধকগণ ছিলেন এক বৃহত্তর রাজশক্তির বিরুদ্ধ শক্তি।

অবশ্য বেশ কিছু তাত্ত্বিক রয়েছেন যাঁরা মনে করেন, ভক্তিসাধনা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করেছে। কারণ, রাষ্ট্রীয় শক্তির বিরোধীতার পরিবর্তে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নির্যাতনের প্রকৃত প্রতিবাদের পরিবর্তে বিদ্যমান সমাজকে সহনীয় করে তুলতে সাহায্য করেছে। সাধক/ সাধিকাগণ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বঞ্চনা থেকে মুক্তির পরিবর্তে আত্মিকমুক্তির মধ্যেই ব্যক্তি প্রচেষ্টাকে আবদ্ধ রেখেছেন। এতে শাসকগোষ্ঠীরই সুবিধা হয়েছে বেশী। যদুনাথ সরকার ও রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় বাঙালী ও উড়িষ্যাবাসীদের দুর্বলতার কারণ হিসেবে এই ভক্তি সাধনাকেই দায়ী করেন। অবশ্য এ ধরনের সিদ্ধান্তের সমর্থনে কোন গ্রহণযোগ্য ও সুনির্দিষ্ট প্রমান তাঁরা হাজির করেননি।

বিজ্ঞানের সঙ্গে সামাজিক আন্দোলনের সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে এ রহমান মন্তব্য করেন, ভক্তির প্রাধান্যের কথা বলা হলেও এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভক্তি সাধকদের উপস্থিতি থাকলেও সামগ্রিক বিচারে ভক্তি একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি। পরিবর্তে, বিভিন্ন ভক্তিসাধককে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সম্প্রদায়

গড়ে ওঠে এবং সম্প্রদায়গুলি নিজ নিজ গুরুর আদর্শ প্রচার করতে থাকে। একমাত্র গুরু নানকই এক বৃহত্তর আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং যা অচিরেই সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে পরিনত হয় এবং পরিশেষে এক ভিন্ন ধর্ম, শিখ ধর্মের জন্ম দেয়।

৩৬.১০ সারাংশ

এই এককটিতে আলোচিত হল সুফিবাদ ও ভক্তি আন্দোলন। সুফিবাদের উদ্ভব, প্রসার ও বৈশিষ্ট্য, সুফিবাদ ও ভক্তি আন্দোলনের সম্পর্ক, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভক্তি আন্দোলনের বিস্তার, ভক্তি আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়গুলি এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। সর্বোপরি, বর্তমান কালে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার প্রশ্নে ভক্তি আন্দোলনের ফলাফল ও প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে।

৩৬.১১ অনুশীলনী

১। সুফিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

২। ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভবের কারণগুলি উল্লেখ করুন।

৩। বাংলার ভক্তি আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করুন।

৪। ভক্তি আন্দোলনের ফলাফলগুলি আলোচনা করুন।

৫। ভারতে সুফিদরবেশদের অবদানগুলি কী কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন

১। সুফি শব্দটির অর্থ কী?

২। সুফি ও ভক্তি আন্দোলনে সমন্বয়বাদী ধারাটি উল্লেখ করুন।

৩। ভক্তি আন্দোলনের কারণ হিসেবে আপনি কোনটিকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করবেন?

৪। ভক্তি আন্দোলনে মীরাবাঈ-এর ভূমিকা কী?

৫। ভক্তি আন্দোলনের ইতিবাচক দিকগুলি কী কী?

৩৬.১২ গ্রন্থপঞ্জী

আমিনুল ইসলাম (১৯৮৫/১৯৯৫) — মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত (বঙ্গাব্দ ১৩৮৩) — ভারতবর্ষ ও ইসলাম, কলিকাতা।

Ahmed Aziz (1964/1999) — Studied in Islamic Culture in the Indian Environment, New Delhi, oxford India.

A.L. Bashan (ed) (1975/1999) — A Cultural History of India, New Delhi,Oxford India.

Chinmoyee Chatterjee (Vol. I 1976/Vol.II 1981) — Evolution of Bhakti Cult. Vol. I & II, Calcutta J.U.

Krishna Sharma (1987) — Bhakti and the Bhakri movement. A new Perspective, Delhi, Munsiram Monoharlal.

D.N. Jha (ed) (1996) — Society and Ideology in India : Essays in honour of Professor R. S. Sharma, Delhi Munsiram Monohar Lal. এই গ্রন্থটি থেকে যে প্রবন্ধটি পড়া প্রয়োজন —Hitesh Ranjan Sanyal - Trends of change in Bhakti Movement in Bengal (Sixteenth & Seventeenth Centuries)

D. P. Chattapadhyay & Rabindra Kumar (997)– Science, Philosopy and culture Vol-II, Delhi, PHISP. এই গ্রন্থটি থেকে যে প্রবন্ধটি পড়া দরকার— Vijaya Ramaswami - Women Saints in Medieval Indian society এবং A. Rahman - Science and social movements.

R. C. Majumdar (ed) (1960)—The Delhi sultanate—Bharatiya Vidya Bhaban's History and Culture of Indian People, Vol. VI, Bombay.

Sarah F. D. Ansari (1992)—Sufi Saints and State Power : The Pirs of Sind 1843-1947, Cambridge, Cambridge University Press.

Satish Chandra (1996/1997)—Historiography Religin and State in Medieval India Delhi, Har Anand Pub.

Tara Chand (1976)—Influence of Islam on Indian Culture, Allahabad, The Indian Press.

একক ৩৭ □ রাজা রামমোহন রায়

গঠন

৩৭.০ উদ্দেশ্য

৩৭.১ প্রস্তাবনা

৩৭.২ আধুনিকতার পথিকৃৎ রামমোহন

৩৭.৩ রামমোহনের উদারপন্থী ভাবনা

৩৭.৩.১ স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণা

৩৭.৩.২ মুদ্রণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম

৩৭.৩.৩ ক্ষমতা স্বতন্ত্রী করণের সমর্থন

৩৭.৩.৪ আইনের অনুশাসন নীতির সমর্থন

৩৭.৪ বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের প্রয়াস

৩৭.৫. রামমোহনের সমাজ চেতনা ও সংস্কার আন্দোলন

৩৭.৫.১ শিক্ষাগত দৃষ্টি ভঙ্গী

৩৭.৫.২ নারীর নিরাপত্তা বিধান

৩৭.৫.৩ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী

৩৭.৫.৪ আর্থনীতিক ধ্যানধারণা

৩৭.৫.৫ আন্তর্জাতিক মনস্কতা

৩৭.৬ রামমোহনের চিন্তাধারার মূল্যায়ন

৩৭.৭ সারাংশ

৩৭.৮ অনুশীলণী

৩৭.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৩৭.০ উদ্দেশ্য

আধুনিক ভারতের অন্যতম অগ্রদূত রামোহন রায়ের রাজনীতি ও সমাজচিন্তনের বিশিষ্ট দিকগুলি বিধৃত হয়েছে এই এককে। এটি অনুধাবন করলে আপনি জানতে পারবেন :

- এদেশে আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রথম সুসংবদ্ধ বিস্তার উদ্ভব হ'ল কিভাবে;
- আধুনিকতার কোন্ কোন্ উপাদান ঠাঁই পেল সেকালের প্রায়নিশ্চল, রক্ষণশীল ভারতীয় সমাজে;
- ঔপনিবেশিক শাসনের একেবারে প্রথম যুগেই স্বাধীন চেতনার উন্মেষ ঘটাতে রামোহনের ভূমিকা কী ছিল;
- গতিহীন, সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের পরিবর্তন সাধনে রামমোহন কী কী উদ্যোগ নিয়েছিলেন; এবং
- সেকাল ও একালের প্রেক্ষিতে রামমোহনের প্রকৃত মূল্যায়ণ কী হওয়া উচিত।

৩৭.১ প্রস্তাবনা

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। সেটি হল ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্যে তখন পশ্চিম ইউরোপের ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশগুলি এক ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ব্যবস্থাকে পিছনে ফেলে এক নতুন যুগকে স্বাগত জানিয়েছে। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কুসংস্কার ও স্বৈরাচারের অচলায়তনকে ভেদ করে সভ্যতার এক নতুন অধ্যায় উন্মোচিত হতে চলেছে। শিল্পে-বাণিজ্যে-বিজ্ঞাপন সাধনায় যেমন, তেমনই আবার সমাজ-সংগঠন, রাষ্ট্রীয় বিধান এবং সমাজচর্চা সর্বক্ষেত্রেই পরিবর্তনের জোয়ার।

পৃথিবার এক মহাদেশ যখন এভাবে নবযুগ তথা আধুনিক সভ্যতাকে স্বাগত জানাচ্ছে, এশিয়া মহাদেশে ভারত তখন সামন্ততান্ত্রিক স্থবিরতার বেড়াজালে বন্দী। ভারতের সেই মধ্যযুগীয় জড়ত্বের মধ্যে আধুনিকতার ভগীরথ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। সমাজের সমস্ত অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করে গেছেন।

৩৭.২ আধুনিকতার পথিকৃৎ রামমোহন

রামমোহনের বলিষ্ঠ মানসিকতার মূলে ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা এবং অনন্যসাধারণ জ্ঞানানুশীলন। একদিকে প্রাচ্যের বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য সমাজের অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের প্রধান অস্ত্র ছিল। অপরদিকে পাশ্চাত্যের নতুন যুগের যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল, উদারপন্থী চিন্তাধারার উপলব্ধি ছিল তাঁর আধুনিক মননশীলতার উৎস। এই আধুনিকতার সম্পর্কে তিনি বাংলা তথা ভারতের বুকে আনতে চেয়েছিলেন নতুন প্রাণের স্পন্দন।

রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর উদারপন্থী মনোভাব। এক সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি উদারনীতিবাদের জন্মভূমি ইউরোপের ইতিহাসে অনুশীলন করেছিলেন এবং রেণেশাঁস থেকে ফরাসী বিপ্লব পর্যন্ত দীর্ঘ কালপর্বের ঐতিহাসিক গুরুত্বটিকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ইউরোপীয় ইতিহাসের এই কালপর্বই ছিল বুর্জোয়া জাগরণের যুগ। এই বুর্জোয়া জাগরণের ফলেই মধ্যযুগীয় সংকীর্ণতার পরিবর্তে দেখা দিয়েছিল এক যুক্তিনির্ভর, মানবতাবাদী, মুক্ত চেতনার দৃষ্টিভঙ্গী রাজনীতিক চিন্তার ইতিহাসে সেটি উদারনীতিবাদ নামে পরিচিত। উদারনীতিবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল স্বাধীনতা। ধর্মীয় কুসংস্কার ও সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদের শৃংখল থেকে মানুষকে মুক্ত করে মানবসত্তার স্বাধীন বিকাশই ছিল উদারনীতিক রাজনীতিক দর্শনের লক্ষ্য। ব্যাক্তির বিশ্বাস, চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাই ছিল উদারনীতিবাদের দাবী। এক কথায় উদারনীতিবাদ ছিল নতুন যুগের নতুন দর্শন।

ইউরোপের এই বিরাট ঐতিহাসিক পরিবর্তন নতুন যুগের নতুন দর্শনের মর্মবস্তুকে যথার্থভাবে

উপলব্ধি করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক প্রগতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই নতুন যুগদর্শনকে ভারতের মাটিতে তিনি বপন করতে চেয়েছিলেন।

৩৭.৩ রামমোহনের উদারপন্থী ভাবনা

রাজা রামমোহন রায়ের উদারনীতিক চিন্তাধারার ব্যাপ্তি সমকালীন ভারতবর্ষের সমাজজীবনের বিভিন্ন দিককে স্পর্শ করেছিল, ধর্ম, শিল্প, সমাজজীবনে নারীর স্থান, মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার, জাতিভেদ প্রথা, ভারতের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি প্রভৃতি আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক সমস্যার বিভিন্ন দিকে রামমোহন রায়ের উদারনীতিক চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়েছে।

৩৭.৩,১ স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণা

রাজা রামমোহন রায়ের উদারনীতিক চিন্তাধারার বলিষ্ঠ প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে। স্বাধীনতাকে তিনি ব্যক্তি মানুষের জীবনের অমূল্য সম্পদ বলে মনে করেছেন। মানুষের ব্যক্তিত্বের স্বাধীন বিকাশই ছিল তাঁর বিভিন্ন সমাজ সংস্কার মূলক কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য, কেবল ব্যক্তির জীবনে নয়, জাতির জীবনেও স্বাধীন আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে তিনি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামকে তিনি আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি গ্রীক ও নিয়পলিটানদের মুক্তির সংগ্রামকে যেমন অভিনন্দন জানিয়েছেন, তেমনি সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়েছেন ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতার মহান আদর্শকে। স্পেনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তিনি এতই আনন্দিত হয়েছিলেন যে এই উপলক্ষ্যে তিনি কোলকাতায় একটি ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন আবার বোঁর্বোরাজের বিরুদ্ধে নেপলস্ বাসীদের বিদ্রোহ যখন ব্যর্থ হয় তখন তিনি গভীরভাবে বেদনাহত হয়েছিলেন। স্বাধীনতার জয় এবং স্বৈরাচারের বিনাশই ছিল তাঁর কাম্য। ১৮২১ সালে বাকিংহামকে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর এই চিন্তা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই চিঠিতে তিনি লেখেন যে স্বাধীনতার শত্রুরা এবং স্বৈরাচারের মিত্ররা শেষ পর্যন্ত কখনই সফল হতে পারে নি এবং কখনই তা পারবে না।

এহেন স্বাধীনতা-প্রেমী রামমোহন রায় ভারতের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্রিটিশ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। 'Political Thought in India পুস্তকে Thomas Pantham মন্তব্য করেন যে ব্রিটিশ শাসকের প্রতি রামমোহন রায়ের সমর্থনের অন্যতম কারণ ছিল এই যে এই শাসক ব্যবস্থায় জনসাধারণ পৌর স্বাধীণতা ভোগ করে। তিনি এই শাসনব্যবস্থার সুফলগুলিকে ভারতীয় জনজীবনে সম্প্রসারণে আগ্রহী ছিলেন। বিমানবিহারী মজুমদার বলেন যে রামমোহন ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি ব্রিটিশ সাংবিধানিক ব্যবস্থার মর্মবস্তু উপলব্ধি করেন এবং পৌর স্বাধীনতার দাবী জানান। তাঁর সমকালীন যুগের ভারতবাসীদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। দেশ তখন অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। জনচেতনা ও একাত্মবোধের বিশেস অভাব ছিল। সেই কারণে রামমোহন তৎকালীন ভারতবাসীদের স্বশাসনের পক্ষে অনুপযুক্ত বলে মনে করেন এবং তাদের জন্যে রাজনীতিক স্বাধীনতা দাবী করেন নি।

৩৭.৩,২ মুদ্রণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম

রামমোহনের স্বাধীনতা চেতনার এক বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সংবাদপত্র তথা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে সংবাদ পত্রের জনকল্যাণমুখী ভূমিকা সম্পর্কে রামমোহন সম্পূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন। তিনি নিজে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার কেবল পাঠক মাত্র ছিলেন না। তিনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকার প্রকাশকও ছিলেন। ১৮২১ সালে তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য দুটি পত্রিকা হল 'The Brahmanical Magazine' এবং বাংলা সাপ্তাহিকী 'সংবাদ কৌমুদী'। ১৮২২ সালে প্রকাশিত 'মিরাৎ-উল-আকবর' ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ফার্সি সাপ্তাহিকী। ১৮২৩ সালে ভারতের অস্থায়ী গভর্ণর জন অ্যাডামস একটি জরুরী আইন জারী করে সংবাদপত্রের প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। এইভাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ রামমোহন 'মিরাৎ-উল-আকবর' পত্রিকাটি প্রকাশ করা বন্ধ করে দেন। সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে রামমোহন সহ তৎকালীন কয়েকজন বিশিষ্ট মণীষি সুপ্রীম কোর্টের কাছে একটি লিখিত আবেদন পেশ করেন। তবে সুপ্রীমকোর্টে এই আবেদনটি প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্তু রামমোহনের অদম্য প্রচেষ্টা এখানেই থেমে যায় নি। তিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ রাজের কাছে পর্যন্ত স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন। 'On the Bengal Renaissance পুস্তকে অধ্যাপক সুশোভন সরকার মন্তব্য করেন যে ১৮২৩ সালে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্ট এবং ইংল্যান্ডের রাজার কাছে প্রেরিত আবেদন পত্রে রামমোহন যেভাবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করেছিলেন সেটি আমাদের মিলটনের 'Areopagitica'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইংরেজ কবি জন মিলটনের 'Areopagitica' ছিল মানুষের স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার সম্পর্কে এক কালজয়ী রচনা।

দুঃখের বিষয় হ'ল এই যে ইংল্যান্ডের রাজার নিকট প্রেরিত আবেদন পত্রটিও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। রামমোহনের সঙ্গে কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরস্ এর দীর্ঘকাল ধরে বাদানুবাদ চলে। স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্রের স্বপক্ষে রামমোহণের যুক্তি ছিল এই যে ভারতে শক্তিশালী জনমত গঠনের জন্যে এটি বিশেষভাবে প্রয়োজন ছিল। তিনি আরোও বলেন যে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থা প্রসঙ্গে দেশবাসীর মধ্যে অভাব-অভিযোগের অভিব্যক্তির জন্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হওয়া দরকার। তা হলে জনসাধারণের মধ্যে কোন ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে বিদ্রোহের আশংকা থাকবে না। কেবল শাসিতের দিক থেকে নয়, শাসক বা সরকারের দিক থেকেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সংবাদপত্রের মাধ্যমেই সরকার জনমত সম্পর্কে অবহিত হতে পারে এবং জনস্বার্থ সম্পর্কে সঠিক নীতি গ্রহণ করতে পারে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যে রামমোহণের সংগ্রাম তাঁর জীবদ্দশায় সফল হয় নি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে ১৮৩৫ সালে চার্লস মেটকাফ্ -এর দ্বারা Press Regulation Act বা মুদ্রণ নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রত্যাহার ছিল রামমোহণের দীর্ঘকালীন সংগ্রামের জয়যুক্ত ফলশ্রুতি। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যে রামমোহণের এই অক্লান্ত সংগ্রাম তাঁকে ভারতে সাংবিধানিক আন্দোলনের পথিকৃৎ করে রেখেছে।

৩৭.৩.৩ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সমর্থণ

রামমোহনের স্বাধীনতা প্রীতি অবাধ ক্ষমতাকে সমর্থন করে নি। তিনি মনে করতেন যে আইন প্রণয়ণ এবং আইন প্রয়োগের ক্ষমতা একই কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত থাকা উচিত নয়। এইরূপ দ্বৈত ক্ষমতার বলে বলীয়ান হলে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারিতার পথ প্রশস্ত হবার আশংকা থাকে। তিনি ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সমর্থক ছিলেন। ভারতে স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে জনসাধারণের স্বাধীণতা যাতে বিপন্ন না হয় সেই উদ্দেশ্যে তিনি ভারতীয়দের জন্যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ভারতে নিযুক্ত ইংরেজ আমলাদের হাতে ন্যস্ত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ভারতীয়দের জন্যে আইন প্রণয়ণের দায়িত্ব ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা পার্লামেন্টের উপর ন্যস্ত থাকাটা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করতেন। এইভাবে আইন প্রণয়ন ও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজনের ফলে স্থাণীয় শাসন কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারিতা রোধ করে জনসাধারণের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

৩৭.৩.৪ আইনের অনুশাসন নীতির সমর্থন

রামমোহন আইনের অনুশাসন তত্ত্বের সমর্থক ছিলেন। আইনের দৃষ্টিতে সমতাই হ'ল আইনের তত্ত্বের মূল কথা। ব্রিটেনে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হ'ল আইনের দৃষ্টিতে সমতা। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসক নিজেদের এই নীতি প্রয়োগ করলেও ভারতীয় ঔপনিবেশের ক্ষেত্রে এই নীতি কার্যকর করার ব্যাপারে পশ্চাৎপদ ছিল। ভারতে সরকারী ক্ষেত্রে ভারতীয়দের সমান অধিকারের নীতি স্বীকৃত হয় নি। রামমোহন ব্রিটিশ শাসনের এই বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে যোগ্যতার ভিত্তিতে ইংরেজ এবং ভারতীয়দের সমান অধিকারের দাবী জানিয়েছিলেন।

রামমোহন ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্যমূলক জুরি আইনের বিরোধিতা করেছিলেন। এই আইন অনুযায়ী কোন হিন্দু এবং মুসলমান জুরি কোন খ্রীস্টানের বিচার করতে পারতেন না। এই বৈষম্যমূলক ও অবমাননাকর জুরি আইনের বিরুদ্ধে রামমোহনের উদ্যোগে একটি স্মারকপত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট প্রেরিত হয়। এই স্মারকপত্রে মোট দু'শ একুশ জনের স্বাক্ষর ছিল। তাঁদের মধ্যে হিন্দু স্বাক্ষরকারীদের সংখ্যা ছিল একশ ছাব্বিশ। মুসলমান স্বাক্ষরকারীদের সংখ্যা ছিল পঁচানব্বই জন। রামমোহনের প্রবল বিরোধিতার ফলে ১৮৩২ সালে ব্রিটিশ সরকার নতুন জুরি আইন প্রবর্তন করে। সেই আইনে বৈষম্যমূলক শর্তগুলির বিলোপ করা হয়।

রামমোহন অবিবেচনা প্রসূত স্বেচ্ছাচারী আইনকে কখনই সমর্থন করেন নি। জনকল্যান সাধনকেই তিনি আইনের উদ্দেশ্য বলে মনে করেছেন। তিনি ভারতীয়দের জন্যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতে ন্যস্ত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মত একটি দূরবর্তী কর্তৃপক্ষের পক্ষে ভারতের জনজীবনের স্থানীয় সমস্যাগুলি যে পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করা সম্ভব নয় সে সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যাতে ভারতীয়দের জন্যে জনকল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন

করে সেটিই ছিল তাঁর কাছে সর্বতোভাবে কাম্য। এই উদ্দেশ্যে তাঁর প্রস্তাবিত তিনটি ব্যবস্থার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, দেশের প্রকৃত জনমত অনুধাবনের জন্যে তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি মনে করেছিলেন যে ব্রিটিশ শাসন কর্তৃপক্ষ ভারতের জনসাধারণের মতামত সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত হবার জন্যে বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন নিয়োগ করতে পারেন। তৃতীয়ত, তিনি মনে করতেন যে ভারতের জন্যে কোন আইন প্রণয়নের আগে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের পক্ষে ভারতের বিদ্বান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ করা উচিত।

৩৭.৪ বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের প্রয়াস

বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন প্রসঙ্গে রামমোহনের মতামত উল্লেখযোগ্য। রামমোহন দেওয়াণী ও ফৌজদারী আইন বিধিবদ্ধ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার কথা বলেন। তিনি বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর মতে, বিচারকের হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত থাকা উচিত নয়। অনুরূপভাবে বিচার বিভাগ থেকে শাসন বিভাগ স্বতন্ত্র থাকা উচিত। তিনি মনে করতেন যে ইউরোপীয় এবং ভারতীয় বিচারকগণ একত্রে বিচারকার্য সম্পাদন করলে সুবিচার পাওয়া সম্ভব হবে। কারণ ইউরোপীয় বিচারকগণ ভারতীয় ভাষায় পারদর্শী হন না। এই কারণে বিচারকার্য সম্পাদনের ব্যাপারে ভারতীয় বিচারকদের সাহায্য নেওয়া দরকার। তিনি ভারতীয় আদালতগুলিতে জুরির বিচার প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি পঞ্চায়েতের সাহায্যে বিচারকার্য জুরিদের দ্বারা পরিচালনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

৩৭.৫ রামমোহনের সমাজচেতনা ও সংস্কার আন্দোলন

রামমোহনের ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর সমাজচেতনা। একজন প্রকৃত সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তিনি ভারতীয় সমাজকে দেখেছিলেন এবং একথা উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতের মধ্যযুগীয় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছিল অশিক্ষার অভিশাপ এবং বহুবিধ অন্ধ কুসংস্কার ও কুপ্রথার বেড়াজাল। তিনি বুঝেছিলেন যে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের জন্যে ভারতীয় সমাজে প্রয়োজন ছিল এই প্রতিবন্ধকতাগুলির দূর করে সমাজকে প্রগতির পক্ষে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সমাজ সংস্কারের পথে রামমোহনের প্রগতিশীল ভূমিকা তাঁকে বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে অমর করে রেখেছে।

৩৭.৫,১ শিক্ষাগত দৃষ্টিভঙ্গী

রামমোহনের সত্যসন্ধানী দৃষ্টিতে একথা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছিল যে ব্রিটিশ শাসনের পশ্চাতে রয়েছে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান সমৃদ্ধ এক উন্নততর সভ্যতা। তিনি ভারতবাসীকে নবযুগের ধ্যানধারণায় উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্যে পশ্চিমী শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। প্রাচ্যের বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ জ্ঞান এবং সংস্কৃতে তাঁর অসামান্য পারদর্শিতা ছিল। কিন্তু ১৮২৩ সালে লর্ড

আমহার্স্টকে লেখা একটি চিঠিতে দেখা যায় যে তিনি সংস্কৃত শিক্ষার পরিবর্তে গণিত শাস্ত্র, দর্শণ, রসায়ন বিদ্যা, ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিদ্যা চর্চাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে রামমোহন ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের জন্যে ব্যক্তিগত ভাবেও যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় যাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

৩৭.৫.২ নারীর নিরাপত্তা বিধান

বাস্তব সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহন রায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি ছিল সতীদাহ প্রথা নিবারণ। সতীদাহ নিবারণের ক্ষেত্রে রামমোহনের আগেও অনেকের চিন্তা ও প্রচেষ্টার কথা জানা যায়। কিন্তু রামমোহনের মৌলিকত্ব ছিল এই যে তিনিই সর্বপ্রথম এই বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্রিয় হয়েছিলেন। তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে বাংলা ও ইংরেজীতে কয়েকটি বই লিখে নিজের খরচে সেইগুলি ছাপিয়ে বিনামূল্যে সর্বত্র বিতরণ করেন। ১৮১৮ এবং১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহ প্রথা অশাস্ত্রীয় এই মর্মে রামমোহন রায় কর্তৃক লিখিত তিনখানি বাংলা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে ইংরেজীতে লেখা আরোও চারখানি বই প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৮, ১৮২০, ১৮৩০ এবং ১৮৩২ সালে। রামমোহন একথাও বুঝেছিলেন যে সতীদাহ প্রথা সম্পর্কে ধর্মীয় সংস্কার হিন্দুমনের গভীরে এমনভাবে প্রোথিত যে সে সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা কার্যকর করতে হলে একমাত্র উপযুক্ত লোকশিক্ষা ও জনমত গঠনের মাধ্যমেই সেটি সম্ভব। তাই সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা ছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই প্রথার বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন চালিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য দুটি সংবাদপত্রের নাম হল 'বঙ্গাল গেজেটি' ও'সংবাদ কৌমুদী।' সতীদাহ নিবারণের উদ্দেশ্যে কার্যক্ষেত্রে রামমোহনের সক্রিয় ভূমিকাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি একটি ভিজিলান্স কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল সতীদাহ সম্পর্কিত সরকারী নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলি যথারীতি পালিত হচ্ছে কিনা তার ওপর নজর রাখা। তিনি নিজে শ্মশানঘাটে উপস্থিত হয়ে সহমরণে উদ্যত বিধবাদের চিতায় আরোহণ করা থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করতেন।

১৮২৯ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা রদ করে আইন প্রণয়ন করলে ১৮৩০ সালের ১৬ই জানুয়ারী রামমোহন রায় টাউন হলে একটি সভা করে বেন্টিঙ্ককে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালীন হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল নেতৃবৃন্দ বেন্টিঙ্কের আইনকে স্বাগত জানাতে পারেন নি। বেন্টিঙ্কের আইন যাতে কার্যকর না হয় সেই উদ্দেশ্যে সতীদাহ প্রথার সমর্থকরা ইংল্যান্ডে প্রিভি কাউন্সিলে একটি আবেদনপত্র পেশ করেন। এই আবেদনের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে ১৮৩০ সালে রামমোহন ইংল্যান্ডে যাত্রা করেন। প্রিভি কাউন্সিলে রক্ষণশীল গোষ্ঠীর আবেদন পত্রের বিরুদ্ধে রামমোহন আর একটি আবেদন পত্র পেশ করেন এবং রক্ষণশীল গোষ্ঠীর আবেদন পত্রের শুনানীকালে ভারতীয় নারীর পক্ষ হয়ে তিনি সর্বদা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ১৮৩২ সালে প্রিভি কাউন্সিলে রক্ষণশীল হিন্দুগোষ্ঠীর আবেদন নাকচ হয়ে যায়। এইভাবে রামমোহন সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের জন্যে আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন।

সমাজে নারীর মর্যাদার পক্ষে অবমাননাকর যে প্রথাটির বিরুদ্ধে রামমোহন প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন

সেটি ছিল পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা। তিনি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র বিশ্লেষণ করে দেখান যে শাস্ত্রকাররা পুরুষের একাধিক বিবাহকে স্বাভাবিক নিয়ম বলে নির্দেশ করেন নি। শাস্ত্রে এটি ব্যতিক্রম হিসাবেই স্বীকৃত। এই সামাজিক কুপ্রথা দূর করার জন্যে তিনি সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। বস্তুতঃ রামমোহন যথার্থভাবে একথা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে ভারতে দীর্ঘপ্রচলিত কুপ্রথার ভারে জরাগ্রস্ত সমাজের পুনরুজ্জীবনের জন্যে প্রয়োজন ছিল সামাজিক বিষয়ে রাষ্ট্রশক্তির হস্তক্ষেপ।

রামমোহনের চোখে মধ্যযুগীয় সমাজে নারীর অবহেলিত সামাজিক অবস্থানের মূল কারণটি ধরা পরেছিল। সেই কারণটি ছিল আর্থনীতিক কারণ। স্ত্রীলোকের দায়াধিকার সম্বন্ধে তৎকালীন হিন্দুসমাজে প্রচলিত ব্যবস্থাকে তিনি অন্যায় এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলে সমালোচনা করেন। তিনি প্রাচীন শাস্ত্রকারদের বিধান ব্যাখ্যা করে দেখান যে প্রাচীন শাস্ত্রানুসারে মৃত পতির সম্পত্তিতে তাঁর বিধবা পত্নীর পরিবারের অন্যান্য পুরুষ সদস্যদের মতই সমান অধিকার ছিল। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় রামমোহন রায় রচিত 'The Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females' পুস্তিকা। নারীকে আর্থিক ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা প্রদান করাই ছিল তাঁর এই রচনার উদ্দেশ্য।

অর্থের বিনিময়ে কন্যাবিক্রয়ের কদর্থ প্রলোভনকে রামমোহন তীক্ষ্নভাবে সমালোচনা করেন। তিনি একথা বুঝেছিলেন যে সমাজে নারীর বঞ্চনা ও শোষণের অন্যতম কারণ ছিল নারীর শিক্ষা ও সুযোগের অভাব। উদারনীতিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন রামমোহন নারীশিক্ষাকে বিশেষভাবে সমর্থন করেছিলেন।

৩৭.৫.৩ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী

রামমোহনের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে তাঁর উদারনীতিক চিন্তাচেতনা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর ধর্মচিন্তার মূলে ছিল এক সুমহান ঐক্যবোধের উপলব্ধি। 'ভারতপথিক রামমোহন' রচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন যে মানুষে মানুষে ঐক্যই হ'ল মানুষের সমাজের সবচেয়ে বড় তত্ত্ব। এই ঐক্যবোধ যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন সেই দুর্বলতা দেশের সমাজের জীবনে এক দুষ্ট ব্যধির মত ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। এই ঐক্যবোধই হ'ল ভারতের উপনিষদের সনাতন শাশ্বত সত্য। কিন্তু ভারতের অন্তরের এই শাস্বত সত্যটি চাপা পড়ে গিয়েছিল বাহ্যভেদের অন্তরালে। বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের বিভেদের অন্তরালে হারিয়ে গিয়েছিল ধর্মের সুমহান ঐক্যবোধের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। রামমোহন সকল প্রকার ধর্মীয় সংকীর্ণতা, ধর্মীয় বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তিনি "উপনিষদের ঐক্যতত্ত্বের আলোকে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানকে সত্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি কাউকেই বর্জন করেন নি। বুদ্ধির মহিমায় ও হৃদয়ের বিপুলতায় তিনি এই বাহ্যভেদের ভারতে আধ্যাত্মিক অভেদকে উজ্জ্বল করে উপলব্ধি করেছিলেন"।

৩৭.৫.৪ আর্থনীতিক ধ্যানধারণা

রামমোহনের উদারনীতিক চিন্তাচেতনা তাঁর আর্থনীতিক ধ্যানধারণার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। কৃষিপ্রধান

ভারতবর্ষে অর্থনীতির মেরুদন্ড কৃষকদের দারিদ্রের দুঃখকে তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে চিরস্থায়ী এবং রায়তওয়ারি এই দুটি ব্যবস্থার কোনটিই দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে মঙ্গলজনক হয় নি। কৃষকেরা জমিদার ও রাজকর্মচারীদের শোষণের শিকারে পরিণত হয়েছে। তিনি কৃষকের উপর কর বৃদ্ধির ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন নি। তার পরিবর্তে তিনি কৃষকদের করের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি এদেশে ইস্ট ইন্ডিয়াকোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারের পরিবর্তে অবাধ বাণিজ্যের নীতিকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে শিক্ষিত ও ধণী ইংরেজরা এদেশে বসবাস করলে তাদের উন্নত জ্ঞান এবং মূলধনের সংস্পর্শে ভারতে শিল্পায়নের পথ সুগম হবে।

৩৭.৫.৫ আন্তর্জাতিক মনস্কতা

রামমোহনের উদারপন্থী চিন্তাধারা কেবলমাত্র জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণার মধ্যেই সীমিত থাকে নি। তাঁর অন্তর ছিল বিশ্বমানবিক চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ। তাই জাতীয়তাবাদের গন্ডী অতিক্রম করে তাঁর উদাও চিন্তাধারা প্রসারিত হয়েছিল আন্তর্জাতিকতার জগতে। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে একটি পত্র লেখেন। এই পত্রটিতে তিনি একটি জাতি-সংঘ স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতিকে সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ করাই ছিল এই জাতি-সংঘ গঠনের উদ্দেশ্য।

৩৭.৫.৬ রামমোহনের চিন্তাধারার মূল্যায়ন

সমকালে ও উত্তরকালে রামমোহনের চিন্তাধারা বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচিত হয়েছে। সমালোচকগণের মন্তব্য, রামমোহন অন্যান্য দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থক হওয়া সত্তেও নিজের দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ হিসেবে স্বাগত জানান। রামমোহন এবং নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্যান্য অনেকে ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ছত্রছায়ায় একটি উপনিবেশে পরিণত করায় উদ্যোগী হন। সমালোচকগণ আরোও বলেন যে রামমোহন রায় যে আধুনিকতার ধারার পথিকৃৎ ছিলেন সেটি প্রাক্পুঁজিবাদী সমাজ থেকে পূর্ণ পুঁজিবাদী আধুনিকতায় উত্তরণ ছিল না। সেটি ছিল বুর্জোয়া আধুনিকতার এক দুর্বল এবং বিকৃত ব্যঙ্গচিত্র মাত্র। রামমোহন রায় এবং তাঁর সহযোগীদের মতাদর্শ এবং ভূমিকা তাঁদের ভারতে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিতন্ত্রের দেশীয় দালাল হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

সমালোচকগণ আরোও বলেন যে, ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে রামমোহনের বোধ ও উপলব্ধি তাঁর ব্যক্তিক এবং শ্রেনীগত স্বার্থদ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে ও শ্রেণী-অবস্থানের দিক দিয়ে রামমোহন ছিলেন সামন্তযুগীয় ভোগবিলাসী ও সুবিধাভোগী জমিদার। কর্নওয়ালিশ্রের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নতুন ভূমি-সম্পর্কের দ্বারা জমির ওপর জমিদারশ্রেণীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জমিদার শ্রেণীর কাছে ব্রিটিশরা ছিল সৌভাগ্যের অগ্রদূত। তিনি ইউরোপীয় বণিকদের বিভিন্ন ব্যবসায়ে অর্থলগ্নী করতেন এবং সুদের বিনিময়ে অর্থ ঋণ দিতেন। তিনি এদেশে ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্যকে সমর্থন করেছিলেন। ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর সঙ্গে জনস্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় রামমোহনের রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি সমর্থনের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রামমোহনের চিন্তাধারার মূল্যায়নে Thomas Pantham মন্তব্য করেন যে একথা সত্য যে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের অশুভ ফলাফল কি হতে পারে রামমোহন সেটি উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁর রচনাগুলিতে দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদী অনুভূতির কোন প্রকাশ ছিল না। তাঁর সমসাময়িক ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে এই ধরণের অনুভূতি ছিল অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। রামমোহনের উদ্দেশ্যে ছিল স্বতন্ত্র প্রকৃতির। মূলতঃ দুটি কারণে তিনি ব্রিটিশ শাসনকে সমর্থন করেছিলেন। প্রথমত, তিনি দেশীয় জনগণের কল্যাণার্থে ব্রিটিশ শাসনকে স্বাগত জানান এবং এই শাসনের সংস্কার কামনা করেন।। ঔপনিবেশিক শাসন কর্তৃপক্ষ এবং তাদের জনগণ নিজেদের দেশে যে পৌরস্বাধীনতা ভোগ করে ভারতে জনগণ সেই পৌরস্বাধীনতা ভোগ করবে এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। এ দিক থেকে তাঁর চিন্তাধারা ছিল বলিষ্ঠ এবং প্রগতিশীল। দ্বিতীয়ত, তিনি ব্রিটিশ শাসনের পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে ভারতের আর্থনীতিক বিকাশের পথে সহায়ক বলে মনে করেছিলেন। প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির তুলনায় পুঁজিবাদ এবং তার উদারনীতিবাদের আদর্শকে তিনি প্রগতিশীল বলে মনে করেছিলেন। Thomas Pantham এর মতে ব্রিটিশ শাসন রামমোহন এবং নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিকট যে আর্থিক সুফল বহন করে এনেছিল কেবলমাত্র সেই কারণেই তিনি এই শাসনকে সমর্থন করেন নি। একথা সত্য যে তিনি এই সকল সুযোগ সুবিধার অংশীদার ছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে তাঁর অন্যতম আশা ছিল এই যে এই শাসনের মাধ্যমে ভারতে উদারনীতিক ধ্যানধারণার উন্মেষ ঘটবে। তিনি সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতের রাজনীতিক ও আর্থনীতিক একাত্মতার বিরোধিতা করেন নি। কিন্তু তিনি সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থার সংস্কার সাধনে প্রয়াসী হন। তিনি চেয়েছিলেন যে ভারতের জন্য শাসননীতি রচনায় ভারতীয়দের মতামত গ্রহণ করা হোক। তখনও পর্যন্ত ভারতে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয় নি। রামমোহন সেই কারণে দেশবাসীকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে রত হবার আহ্বান জানান নি। বরং তিনি চেয়েছিলেন নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভারতের পুনরুজ্জীবন। এইদিক থেকে তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম রাজনীতিক মডারেট। একথা সত্য যে তিনি ব্রিটিশ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিঃশর্তভাবে ব্রিটিশ শাসনকে স্বাগত জানান নি। ভারত থেকে মুনাফা সংগ্রহ করে বিদেশে চালান দেওয়াকে তিনি সমর্থন করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন যে এদেশে সদয়, শিক্ষিত ও ধনী ইংরেজরা বসবাস করুক। সেক্ষেত্রে ভারতে বিদেশী মূলধনের বিনিয়োগ হবে এবং ভবিষ্যতে শিল্প বিপ্লবের পথ প্রশস্ত হবে এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে সমর্থন করা সত্ত্বেও রামমোহনের উদারনীতিক চিন্তার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদোত্তর বিশ্বসংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণার ইংগিত পাওয়া যায়। তিনি মনে করতেন যে উপনিবেশ এবং ঔপনিবেসিক কর্তৃপক্ষ উভয়ের সমাজব্যবস্থারই ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক এবং আর্থনীতিক সংস্কার সাধনের প্রয়োজন। তখন উদীয়মান বিশ্বসভ্যতার জন্য যেটি প্রয়োজন ছিল সেটি হ'ল একটি নব মানবিক সংস্কৃতি। রামমোহন ছিলেন বিশ্বমানবতার পূজারী। বিশ্বজনীন মানবতার আদর্শ অনুযায়ী বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরোধের পরিবর্তে পারস্পরিক সহনশীলতা ও সহযোগিতাই ছিল তাঁর কাম্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন যে রামমোহন ছিলেন সমকালীন বিশ্বে একমাত্র ব্যক্তি যিনি বর্তমান যুগের তাৎপর্য উপলব্ধি

করতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন যে বিচ্ছিন্ন স্বাধীনতা মানবসভ্যতার আদর্শ নয়। বরং চিন্তা ও কর্মের সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও জাতির পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে সৃষ্ট ভ্রাতৃত্বের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সেই আদর্শ।

৩৭.৭ সারাংশ

ভারতের মধ্যযুগীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজজীবনে আধুনিকতার ভগীরথরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। রামমোহনের চিন্তাধারা ছিল যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল এবং উদারপন্থী। তিনি উদারনীতিবাদের জন্মভূমি ইউরোপের ইতিহাস অনুশীলন করেন এবং উদারনীতিবাদের প্রকৃত মর্মবস্তু উপলব্ধি করেন। উদারনীতিবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল স্বাধীনতা। ধর্মীয় কুসংস্কার এবং সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদের শৃংঙ্খল থেকে মানুষকে মুক্ত করে মানবসত্ত্বার স্বাধীন বিকাশই ছিল উদারনীতিক রাজনীতিক দর্শনের লক্ষ্য। ভারতের ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই উদারনীতিক দর্শনের চিন্তাধারায় ভারতীয়দের উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর উদারনীতিক চিন্তাধারার ব্যাপ্তি সমাজকালীন ভারতবর্ষের সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিককে স্পর্শ করেছিল।

রামমোহনের উদারনীতিক চিন্তাধারার বলিষ্ঠ প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে। ব্যক্তি ও জাতির জীবনে স্বাধীনতাকে তিনি অমূল্য সম্পদ বলে মনে করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে তিনি অভিনন্দিত করেছেন। এ হেন স্বাধীনতা প্রেমী রামমোহন ভারতের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্রিটিশ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছেন। তার কারণ হ'ল এই যে তিনি তাঁর সমকালীন যুগের ভারতবাসীদের স্বশাসনের পক্ষে উপযুক্ত বলে মনে করেন নি। তিনি ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার পৌর স্বাধীনতার সুফলগুলিকে ভারতীয় জনজীবনে সম্প্রসারণে আগ্রহী ছিলেন। এইভাবে তিনি ভারতবাসীকে পৌর স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য আজীবন নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করেগেছেন। রামমোহন ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সামর্থক ছিলেন। আইন প্রণয়ন এবং আইন প্রয়োগের ক্ষমতা পৃথক থাকা উচিত বলে তিনি মনে করতেন। তিনি ভারতীয়দের জন্যে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব মূলক সংস্থা পার্লামেন্টের উপর ন্যস্ত থাকাটা যুক্তি যুক্ত বলে মনে করতেন। রামমোহন আইনের অনুশাসন তত্ত্বের সমর্থক ছিলেন। তিনি সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে ইংরেজ ও ভারতীয়দের সমান অধিকার দাবী করেছিলেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্যমূলক জুরি আইনের বিরোধিতা করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার ভারতের জন্য জনকল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন করবে এটিই তাঁর কাম্য। তিনি দেওয়াণী ও ফৌজদারী আইন বিধিবদ্ধ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার কথা বলেন। তিনি বিচারবিভাগের স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি পঞ্চায়েতের সাহায্যে বিচার কার্য জুরিদের দ্বারা পরিচালনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সমাজ সংস্কারের পথে রামমোহনের ভূমিকা ও অবদান অবিস্মরণীয়। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পুরুষের বহু বিবাহ প্রথার বিরোধিতা, নারীর সম্পত্তির অধিকার সমর্থন, নারীশিক্ষার সমর্থন, জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা, শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রে রামমোহনের অবদানের গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁর

ধর্মচিন্তার মূলে ছিল এক সুমহান ঐক্যবোধের উপলব্ধি। রামমোহনের উদারনীতিক চিন্তা তাঁর আর্থনীতিক ধ্যানধারণার মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। রামমোহনের আন্তর্জাতিক চিন্তাভাবনাও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

সমালোচকদের মতে, রামমোহন ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিতন্ত্রের দালাল। সামন্তযুগীয় ভোগবিলাসী জমিদার রামমোহনের চিন্তাধারা তাঁর ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থদ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল।

রামমোহনের চিন্তাধারার মূল্যায়ণে বলা যায় যে মূলতঃ দুটি কারণে তিনি ব্রিটিশ শাসনকে সমর্থন করেন। প্রথমত, তিনি দেশীয় জনগণের কল্যাণার্থে ব্রিটিশ শাসনকে স্বাগত জানান এবং এই শাসনের সংস্কার কামনা করেন। দ্বিতীয়ত, তিনি ব্রিটিশ শাসনের পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে ভারতের আর্থনীতিক বিকাশের পথে সহায়ক বলে মনে করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসনকে সমর্থন করা সত্ত্বেও রামমোহনের উদারনীতিক চিন্তার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদোত্তর বিশ্বসংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণার ইংগিত পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন বিশ্বমানবতার পূজারী।

৩৭.৮ অনুশীলণী

১। রাজা রামমোহন রায়ের স্বাধীনতা সম্পর্কিত চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করুন।

২। সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহনের ভূমিকার মূল্যায়ন করুন।

৩। রাজা রামমোহন রায়ের রাষ্ট্রচিন্তার একটি সমালোচনামূলক পর্যালোচনা করুন।

৪। রামমোহন রায়কে কী অর্থে আধুনিকতার পথিকৃৎ বলা হয়?

৫। সমাজে নারীর মর্যাদা বিষয়ে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিন।

৬। আইন ও বিচারব্যবস্থার সংস্কারের জন্য রামমোহনের কি ধরণের প্রস্তাব ছিল?

৩৭.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। সৌরেন্দ্রমোহন রায় : বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, সুবর্ণরেখা, ১৯৬৮ (১ম সংস্করণ)

২। প্রদীপ রায় : রামমোহন রায়; এক ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসা, বুকট্রাষ্ট, ১৯৮২

৩। Rabindranath Tagore : Rammohan Raoy : The Inaugurator of Modern Age in India, Sadharan Brahmo Samaj.

৪। R. C. Majumder : Rammohan Roy, Asiatic Society.

৫। Thomas Pantham : The Socio-Religions and Political Thought of Rammohan Roy, in Pantham and Deutsch (ed) Political Thought in Modern India, Sage 1986

৬। R. Chakraborti : Rammohan Roy : His Vision of Social Change, in A. Mukhopadhyay (ed) Bengal Intellectual Tradition, K.P. Bagchi 1979.

একক ৩৮ □ স্বামী বিবেকানন্দ

গঠন

৩৮.০ উদ্দেশ্য

৩৮.১ প্রস্তাবনা

৩৮.২ জাতীয়তাবাদের ধারণা

৩৮.২.১ জাত, ব্যক্তি ও জাতীয়তা

৩৮.২.২ জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিক

৩৮.৩ সামাজিক ন্যায়

৩৮.৩.১ সমাজতান্ত্রিক চিন্তা

৩৮.৪ ধর্ম ও ধর্মসহিষ্ণুতার আদর্শ

৩৮.৫. সারাংশ

৩৭.৬ অনুশীলণী

৩৮.৭ প্রশ্নাবলী

৩৮.০ উদ্দেশ্য

সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে ভারতীয় চিন্তনের স্বকীয়তা এই যে, রাষ্ট্রীয় জীবনের বাইরে অবস্থান করেও ভূয়োদর্শী যাঁরা তাঁরা নতুন ভাবনার, নতুন পথের দিশারী হয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা এক্ষেত্রে অনন্যসাধরণ। তাঁর সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা নিয়ে লেখা এই এককটি পড়লে আপনি সম্যক বুঝতে পারবেন :

- ভারতীয় সমাজের মূল যে আত্মিক শক্তি তার পরিচয়;
- সমাজের যাবতীয় বৈষম্য, দুরাচারের বিরুদ্ধে জনসংহতি ও জনচেতনা উদ্বোধনের প্রয়োজন;
- এদেশে জাতীয়তাবোধের উন্মেষে জাতীয়তার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ পুরুষের উদ্দীপক অথচ সতর্ক বিশ্লেষণ;
- সমাজসংস্কার নয়, পরিপূর্ণ সমাজবিপ্লব যাঁর অভিপ্রেত, সেই স্বামীজীর সাম্যবাদী অবস্থান; এবং
- ধর্মসাধনার চূড়ান্ত উপলব্ধির স্তর থেকে প্রকৃত ধর্মবোধ কী সে বিষয়ে নির্মোহ, অসঙ্কীর্ণ মনোভাব।

৩৮.১ প্রস্তাবনা

স্বামী বিবেকানন্দ প্রচলিত অর্থে রাষ্ট্রদার্শনিক ছিলেন না। বাস্তব রাজনীতির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল না। তিনি ছিলেন স্বদেশ প্রেমিক, মানবতাবাদী মহাচিন্তানায়ক যাঁর চিন্তাকে কোন দেশ বা কালের গন্ডী দিয়ে সীমাবদ্ধ করা যায় না। আদর্শ মানুষ ও আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা, পরাধীন দেশকে জাগিয়ে তোলা

এবং বিশ্বের দরবারে ভারতকে মর্যাদার আসলে অধিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। মানুষ সেবার মহান আদর্শই ছিল তাঁর জীবনের মাহমন্ত্র। তাঁর বিশাল চিন্তা রাজ্যের স্রোত বহুমুখী বিষয়ের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই বিপুল চিন্তাস্রোতের মধ্যেই রাষ্ট্রদর্শনের বিভিন্ন প্রসঙ্গ সম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট ধ্যানধারণার পরিচয় পাওয়া যায়।

৩৮.২ জাতীয়তাবাদের ধারণা

পরাধীন ভারতবর্ষের অগৌরবের দিনে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ছিল এক ঐতিহাসিক প্রয়োজন। বিবেকানন্দের চিন্তাধারা তাঁর সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনীতিক চিন্তার ক্ষেত্রে ছিল এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ছিল এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। ব্রিটিশ শাসনযুগে উদারনীতিবাদের প্রথম উন্মেষ দেখা যায় রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তায়। রামমোহন উদারনীতিবাদের জন্মভূমি ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান সমৃদ্ধ উন্নতর প্রগতিশীল সভ্যতার সুফলগুলিকে ভারতের মাটিতে আহরণ করতে চেয়েছিলেন এবং ব্রিটিশ শাসনকে ভারতবাসীর জীবনে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে করেছিলেন। রামমোহন সমকালীন ভারতবাসীদের স্বশাসনের পক্ষে উপযুক্ত বলে মনে করেন নি। ব্রিটিশ শাসনের ছত্রছায়ায় থেকে ভারতবাসী পৌর স্বাধীনতা ভোগ করুক সেটিই ছিল তাঁর কাম্য। রামমোহনের পরবর্তীকালে তাঁর অনুগামীরাও ব্রিটিশ সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে ভারতে আধুনিকতার অগ্রদূত বলে মনে করেন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করার থেকে এই শাসনের প্রতি অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ করার থেকে এই শাসনের প্রতি অনুগত থাকাকেই তাঁরা বাঞ্ছণীয় বলে ভাবতেন। আবেদন-নিবেদনের রীতিই ছিল তাঁদের দাবীপূরণের পথ।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ভিন্ন পথের পথিক। আবেদন-নিবেদনের রীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। পরানুকরণ এবং ভিক্ষার মাধ্যমে ভারতে স্বাধীনতা ও সভ্যতার বিকাশ ঘটবে এই দাসসুলভ মনোভাবের প্রতি তিনি ঘৃণা পোষণ করতেন। হীনস্পস্যতার পরিবর্তে আত্মবিশ্বাসের বলিষ্ঠ মনোভাবের দ্বারা দেশবাসীকে জাগিয়ে তোলাই ছিল তাঁর চিন্তাধারার অনন্য বৈশিষ্ট্য। বিবেকানন্দের বাণী ছিল আত্মশক্তি উন্মেষের অগ্নিবাণী। তাঁর সমকালীন উদারনীতিক চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ চিন্তাধারা পরাধীন জাতির মনে শক্তি ও সাহসিকতার বীজ বপন করে। আত্মগ্লানি ও হতাশায় নিমজ্জমান পরাধীন ভারতবাসীর কাছে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এক নতুন যুগের, এক নতুন পথের দিশারী।

নির্ভীক স্বাদেশিকতার মন্ত্রে বিবেকানন্দ সমগ্র দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ তাঁর চিন্তাধারায় একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। বিবেকানন্দ জাতীয়তাবাদকে এক আধ্যাত্মিক পটভূমির উপর স্থাপন করেছিলেন। পরাধীনতার শৃংখল মুক্ত করার জন্যে তিনি দেশকে মাতৃরূপে বন্দনা করে দেশবাসীর হৃদয়ে স্বদেশপ্রেমের আবেগ সঞ্চার করেছিলেন। তাঁর ভাষায়, 'আগামী পঞ্চশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের পরম আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই'। স্বদেশপ্রেমের অভয়মন্ত্রে তিনি দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি